

আর কারও নয়। -হু.

যদি এটা তোমার হাতে পড়ে, মেঘ ডাকার আগে খুলো না।

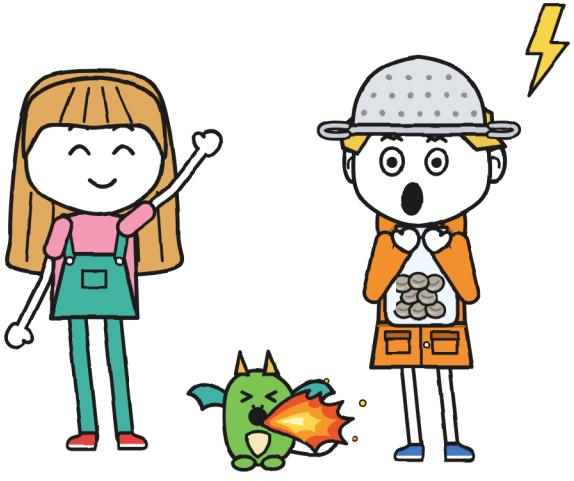


এই সিলমোহর বোঝায়, যা শুধু গল্পে ঘটে: তুমি এটা কোরো না। কয়েক পাতা জুড়ে থাকলে লেখা থাকে "এখান থেকে" আর "এখান পর্যন্ত"। সত্যিকারের ঝড়ে শেষ পাতাটা দেখো। -হু.

অসম্ভব ডেলিভারি · ২

মেঘ ডাকার আগে খুলবেন না

Lui Eriksson



সাইজ XL · সচিত্র উপন্যাস · ১৩+

অসম্ভব ডেলিভারি · ২
মেঘ ডাকার আগে খুলবেন না

সিরিজের দ্বিতীয় বই। প্রথমটা: “এই পার্সেলটা কামড়ায়”।

লেখা ও ছবি: Lui Eriksson

বাংলা সংস্করণ: LinguAula

সাইজ XL · সচিত্র উপন্যাস · ১৩+

প্রথম সংস্করণ: ২০২৬

© ২০২৬ Lui Eriksson · info@linguaula.com

ক্লাসের জন্য আর বাড়ির জন্য নির্দ্বিধায় ফটোকপি করা যাবে।

ফন্ট: Andika, Patrick Hand, Caveat, Courier Prime, Atma, Galada ও Hind Siliguri (SIL OFL লাইসেন্স)।

linguaula.com-এ প্রতিটা অধ্যায় নিয়ে কাজ করো

এই বই লেখার সময় একটা মেঘের ডাকও চোট পায়নি। -হু.



অধ্যায় ১

ঝড়-শিকারি

উল্টোদিকের দোকানে একটা পার্সেল কাঁপছে।

গত শনিবার ওটা একবারই নড়েছিল। তারপর থেকে আর থামেনি: একটানা মিহি কাঁপুনি, পশুচিকিৎসকের অপেক্ষা-ঘরে বসা ছোট্ট কুকুরের মতো। সাত দিন ধরে এমন চলছে। প্রতিদিন একটু একটু বেশি।

আর আমার একটা নতুন খাতা আছে।

১ নম্বর খাতাটা আমার শেষ হয়ে গেছে। অসম্ভব ডেলিভারির মালিক মারা আমাকে এটা দিয়েছেন: নীল মলাট, আর এক কোণে দোকানের লাল সিলমোহর। প্রথম পাতায় আমি নামটা লিখলাম, একটা নতুন শব্দ জুড়ে:

ডেলিভারির খাতা ২ · গুনির। অফিশিয়াল।

"অফিশিয়াল" মানে আগে আমি পড়ব। অফিশিয়ালি। –হু.

মারা বলেন, অফিশিয়াল খাতায় আঁকাআঁকি করতে নেই। দেখা যাক: এটায় এর মধ্যেই একটা ছবি আছে।

আগের খাতা নিয়ে যেটুকু জানা দরকার: দুই শনিবার আগে হুলিতা (সবুজ নোটগুলোর হুলিতা) আর আমি রাতে, সাঁকো দিয়ে, কোনো বড় ছাড়া, এমন একটা ডিম পৌঁছে দিয়েছিলাম, যেটা বছরের পর বছর কেউ পৌঁছে দিতে পারেনি। এখন সেটা

টুকরো, ড্রাগনের এক ছানা, যে আমার সবকিছু নকল করে। দোকানের জাদুকরী মারা আমাদের শাস্তি দিয়েছেন: প্রতি শনিবার ওখানে, সকাল দশটায়। আমি পাড়ায় নতুন, আর আমার প্রায় সবকিছু এখনও বাক্সে।

যেটা কাঁপছে সেটা ২ নম্বর। ওটা ফেরত পার্সেলের তাকে আছে, আর ওর গায়ে এমন একটা লেবেল, যা আমার মুখস্থ: এই সপ্তাহে প্রতি বিকেলে ওটা পড়েছি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, না ছুঁয়ে, আর মারা এমন ভান করেছেন যেন আমাকে দেখতেই পাচ্ছেন না:

- নং ২ · ভঙ্গুর।
- গন্তব্য: ফ্লোরা, ৯, খাল রোড।
- নির্দেশ: মেঘ ডাকার আগে খুলবেন না।
- প্রেরক: র.

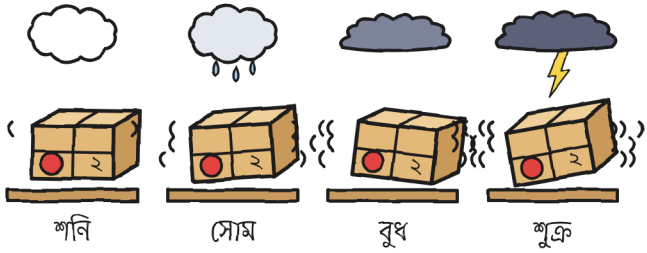
চারপাশে তেইশটা “ফেরত” সিলমোহর। আমি দুবার গুনলাম, যদি কোনোটা খসে পড়ে থাকে।

ফেরত পার্সেল হলো এমন পার্সেল, যা কেউ পৌঁছে দিতে পারেনি: যে নেয়, সে যদি ওটায় মোছে না এমন কালিতে সই না করে, তাহলে ভোর হলে ওটা উড়ে নিজের তাকে ফিরে যায়, সারি বেঁধে, হাঁসের মতো। বাকি আছে উনিশটা: দেয়ালে সেটা লেখা, সবুজ কালিতে, হুলিতার হাতের লেখায়, আর হুলিতা সবুজ কালিতে যা লেখে তা মোছে না। সবগুলো পাঠান একই মানুষ, র.; ওঁর সম্পর্কে শুধু এটুকু জানা যায় যে ওঁর হাতের লেখা ভীষণ খারাপ।

প্রতি বিকেলে আমি টুকে রাখতাম ওটা কতটা কাঁপছে আর আবহাওয়া কেমন: এভাবেই তৈরি হলো ২ নম্বরের কাঁপুনি-মিটার। শুক্রবার মেঘের ভেতরে একটা বাজ ছিল।

ভয়ে কাঁপছে না: ঝড় আসছে বলে কাঁপছে। শনিবার, বিকেল ছয়টায়। আবহাওয়ার খবরে আমি ছয়বার দেখে নিয়েছি। -হু.

কাঁপুনি-মিটার
নং ২-এর



নোটটা আমি দুবার পড়লাম। দ্বিতীয়বার, শুধু ছটার অংশটা।



শনিবার সকাল দশটায় মারা (বেগুনি টুপি, আর এমন সিলমোহর, যা থেকে নিভে যাওয়া মোমের গন্ধওয়ালা ফুলকি ছোটে) কাউন্টারের পেছনে ২ নম্বর পার্সেলটা হাতে নিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাকে নয়: হাতে। সিলমোহরের পাশে তখনও রাবারের ব্যাণ্ডটা ছিল, কারও না থাকার পর থেকে যেটা আমার। আর বিজলির ডেলিভারি-বয় তোনিও দাঁড়িয়ে ছিল, হেলমেট মাথায়: শনিবারগুলো ওর শাস্তিও, আর তোনিও শাস্তি কাটে ঠিক যেভাবে ডেলিভারি করে, সময়মতো আর কিছু না খুলে।

"তেইশ বার আমি নিজে এটা পৌঁছে দিতে গেছি," মারা বললেন। "আর একবারও ঝড়ের মধ্যে নয়।"

মারা লেবেলটার ওপর বুড়ো আঙুল বুলিয়ে নিলেন। আমি দোকানের কাচের জানালার দিকে তাকালাম, যেটা ক্রমেই ধূসর হচ্ছিল: আজকের যাত্রাটা অন্যদিনের মতো হবে না।

"এটা," মারা ঘোষণা করলেন, "তোমরা পৌঁছে দেবে। আজ বিকেলে।"

হুলিতা এমন এক লাফ দিল যে প্রায় "বাকি ১৯" লেখা সাইনবোর্ডটা ছুঁয়ে ফেলল, আর নামতে নামতেই কথা বলতে শুরু করে দিয়েছিল। আমি লাফালাম না: দুটো কথা

আমার ভেতরে আটকে রইল, “আজ বিকেলে”, আর একটা সময়, ছটা, যেগুলো পার্সেলটার চেয়েও ভারী লাগছিল।



মারা তিনটে শর্ত দিলেন, আঙুলে গুনে গুনে:

১. পাঁচটায় রওনা দেবে, ঝড় আসার আগে, আর ঝড় না থামা পর্যন্ত ফ্লোরার বাড়িতে থাকবে।
২. তোমাদের বাড়ির লোকেরা জানে, ফ্লোরাও জানেন।
৩. নিয়মটা লেবেলেরই: মেঘ ডাকার আগে খোলা যাবে না। আর সেটা হতে হবে মাথার ওপরের ডাক: দূরের ডাক ধরা হবে না।

চালাকিটা আমি চিনে ফেললাম: এগুলো প্রায় হুবহু ভেরার বকুনির নিয়ম, ভেরা টুকরোর মালকিন, কিন্তু বলা হলো আগে, পরে নয়। মারা বকুনির সময় ছিলেন না, তবু জেনে গেছেন: এই পাড়ায় বকুনি পার্সেলের আগে পৌঁছে যায়।

“আর তুমি যাচ্ছ না?” হুলিতা জিজ্ঞেস করল।

“এখানে আমার কাজ আছে,” মারা বললেন, আর কাচের জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকালেন, যেটা ধূসর হয়ে আসছিল।

কাউন্টারের শেষ মাথায় ভাঁজ করা একটা কম্বল ছিল, এক জোড়া স্কি করার কানঢাকা আর একটা সসপ্যান। আমি সবই দেখলাম। আমি পার্সেলটার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

তারপর হুলিতা আমার দিকে তাকাল।

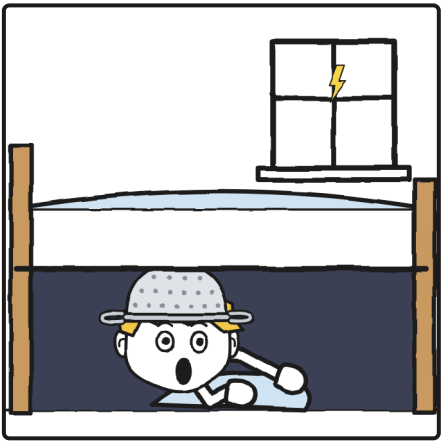
“তোমার ঝড় ভালো লাগে?”

প্রশ্নটা ও করল আমার চোখে চোখ রেখে। আমি সত্যিটা বলতে পারতাম। বললাম এটা:

“খুব ভালো লাগে। আমার আগের পাড়ায় আমি প্রফেশনাল ঝড়-শিকারি ছিলাম।”

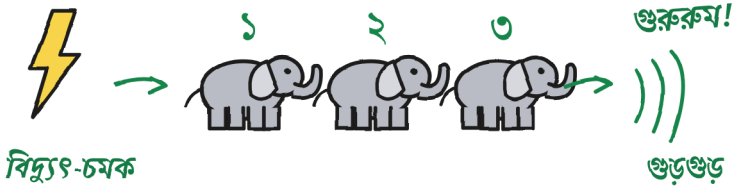
আগের খাতায় একটা মিথ্যে ফিরে আসতে একটা দিন আর একটা রাত লেগেছিল। এবার ঠিক করলাম পথটা ছোট করে দেব: মিথ্যেটা আমি সেদিন সকালেই এঁকে ফেললাম, আর পাশের খোপে সত্যিটা।





ছাঁকনিটা ছিল রান্নাঘরের, স্টিলের, দুটো হাতলওয়ালা। ওটা বাজ থামায় না। আমার শুধু মাথার ওপর কিছু একটা থাকলে সুবিধে হয়। এখন ওটা বাড়ি বদলের কোনো একটা বাক্সে পড়ে আছে, সেই কাঁচিগুলোর পাশে, যেগুলো মা এক সপ্তাহ ধরে খুঁজছে।

হুলিতা আমাকে শেখাল কীভাবে ঝড় গুনতে হয়, আমার খাতায়, অনুমতি না নিয়ে আর সবুজ কালিতে।



এক হাতি, দুই হাতি, তিন হাতি...

১ হাতি = ১ সেকেন্ড

৩ হাতি = ১ কিলোমিটার (মোটামুটি)

০ হাতি = ঠিক মাথার ওপর!

↖ ওটাই লেবেলের মেঘের ডাক।
দূরের ডাক পার্সেল খোলে না।

আরও হাতি: ওই বাজ আরও দূরে পড়েছে।

মেঘের ডাক শুনলে, দূরের হলেও: নিরাপদ জায়গায় চলো!

গোনা হয় বিদ্যুৎ-চমক থেকে মেঘের ডাক পর্যন্ত, হাতিতে: “এক হাতি” মোটামুটি এক সেকেন্ড, আর প্রতি তিনটেয় এক কিলোমিটার। এভাবে মোটামুটি বোঝা যায় ওই বাজটা কত দূরে পড়েছে; পরেরটা কোথায় পড়বে, তা বোঝা যায় না। আর গোনা এটাও বলে না কখন বাইরে বেরোনো যাবে, আর সেটা, হুলিতার মতে, আলাদা একটা নিয়ম, ছবি ছাড়া: শেষ মেঘের ডাকের আধ ঘণ্টা পরে।

আমি মনে মনে চেষ্টা করে দেখলাম, আর আমার হাতিরা বেরোল ভীষণ তাড়াতাড়ি, যেগুলো কোনো কাজে লাগে না। আমার কিছু গোনার দরকার ছিল না, কারণ ঝড় আমার খুব ভালো লাগে, তবু লিখে রাখলাম, যদি কাজে লাগে।

তোনিও আমার কাঁধের ওপর দিয়ে লেবেলটা পড়ল, যেভাবে ও নিজের নয় এমন সবকিছু পড়ে।

“বিজলি ঝড়ে ডেলিভারি দেয় না,” ও বলল, আর ওর হলুদ ব্যাগের ছোট অক্ষরের লেখাটা আমাদের দেখাল: বিজলি ডেলিভারি · দশ মিনিটে, নইলে বিনামূল্যে, আর হুলিতার আতশি কাচে একটা তারা-চিহ্ন: *ঝড় বাদে।

“এখনও তো ঝড় নেই,” হুলিতা বলল।

তোনিও ছোট অক্ষরের লেখাটা আবার পড়ল, যদি “এখনও”-র কথা কিছু থাকে। কিছু ছিল না।

তাই তোনিও আমাদের সঙ্গে এল। ও হাতি গোনে এক ঝটকায়, “একদুইতিন!”, যেন ওগুলো একটা চালান। তোনিওর মতে, সব ঝড়ই এক কিলোমিটার দূরে। জানি না এটা সাহস, না হাতির অভাব।



পাঁচটায় আমি রাস্তা পেরিয়ে বাড়ি গেলাম রেনকোট আনতে; হুলিতা নিচের সদর দরজায় আমার জন্য অপেক্ষা করল। মা ফ্ল্যাটের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল, হাত থেকে রেনকোটটা ঝুলিয়ে। কমলা রং নিয়ে মায়ের একটা তত্ত্ব আছে: ওটা দূর থেকে দেখা যায়। কোথা থেকে দেখবে বলে মা ভাবছে, তা আমি কখনও জানতে পারিনি।

“কমলা রঙেরটা পরো,” মা বলল। “তুমি ঠিক যেতে চাও? মেঘ ডাকলে তো তুমি...”

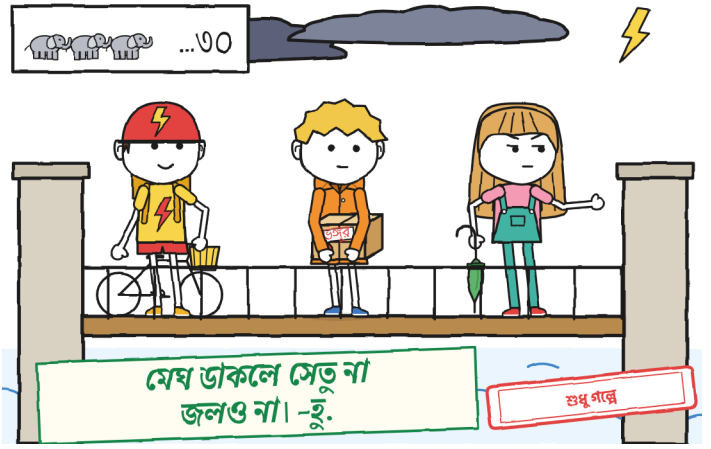
“টা-টা, মা!”

আমি দু ধাপ করে সিঁড়ি বেয়ে নামলাম। হিসেব করেছিলাম, সিঁড়ির ঘরের প্রতিধ্বনিতে মায়ের কথার অর্ধেকটা পথেই হারিয়ে যাবে। হারাল না। হুলিতা নিচেই ছিল।

"মেঘ ডাকলে তো তুমি..." কী? -হু.

আকাশ ক্রমেই আরও কালো হচ্ছিল, আমরা বড় সেতু পার হলাম। রাতে ওটা তুলে দেওয়া হয় যাতে নৌকা যেতে পারে; দিনে সবাই পার হয়, আর ওই সময়ে পার হচ্ছিলাম শুধু আমরা, আর উল্টোদিকে তাড়াহুড়ো করা এক ভদ্রলোক, ঝড় আসার সময় যেটা ঠিক দিক। আমি ২ নম্বরটা দু হাতে ধরে ছিলাম, একদম সোজা করে। তোনিও সাইকেলটা ঠেলে নিচ্ছিল: বিজলিকে এত আস্তে যেতে আমি আর কখনও দেখিনি, পথ হারানো ছাড়া।

মাঝখান দিয়ে যাওয়ার সময় হুলিতা জলের দিকে ওর শুকনো সম্ভাষণটা জানাল, হাত তুলে, ছোট করে, হাসি ছাড়া, যেন এমন কাউকে, যাকে ও পছন্দ করে না। সাঁকোর সেই রাত থেকে ও এটা করে। আমার মনে হয় এটাই চুক্তি: ও সম্ভাষণ জানায়, আর জল ওকে যেতে দেয়।



অনেক দূরে আকাশ জ্বলে উঠল।

মেঘের আড়ালে সেটা ছিল এক পলকের ঝিলিক, শব্দহীন, যেন কেউ এমন একটা ঘরের আলো জ্বালছে আর নেভাচ্ছে, যেখানে তুমি নেই। হুলিতা থমকে দাঁড়াল আর চোখ বুজে নিচু গলায় হাতি গুনল। কিছু শোনার আগে ও তিরিশ গুনল। আমি ওর সঙ্গে মনে মনে গুনলাম, আমার সেই ভীষণ তাড়াতাড়ির হাতিদের নিয়ে, আর আমার হলো বিয়াল্লিশ।

গুরুরুম।

"ওই বাজ পর্যন্ত প্রায় দশ কিলোমিটার," ও হিসেব করল। "আবহাওয়ার খবর বলছে, ঝড় আসবে ছটায়।"

"মেঘ ডেকেছে!" তোনিও চেঁচিয়ে উঠল। "এবার খোলা যায়?"

"পার্সেল খোলার জন্য ওটা ধরা হয় না," হুলিতা চোখ না খুলেই বলল। "ওটা দশ কিলোমিটার দূরে; লেবেলের ডাক হলো মাথার ওপরেরটা: শূন্য হাতি। কিন্তু শোনা তো যাচ্ছে: নিরাপদ জায়গায় চলো! দৌড়াও!"

আমি খাল রোড পর্যন্ত দৌড়ালাম, এমন ভান করে যেন কিছুই শুনিনি। না গুরুরুম, না ছটার কথা।

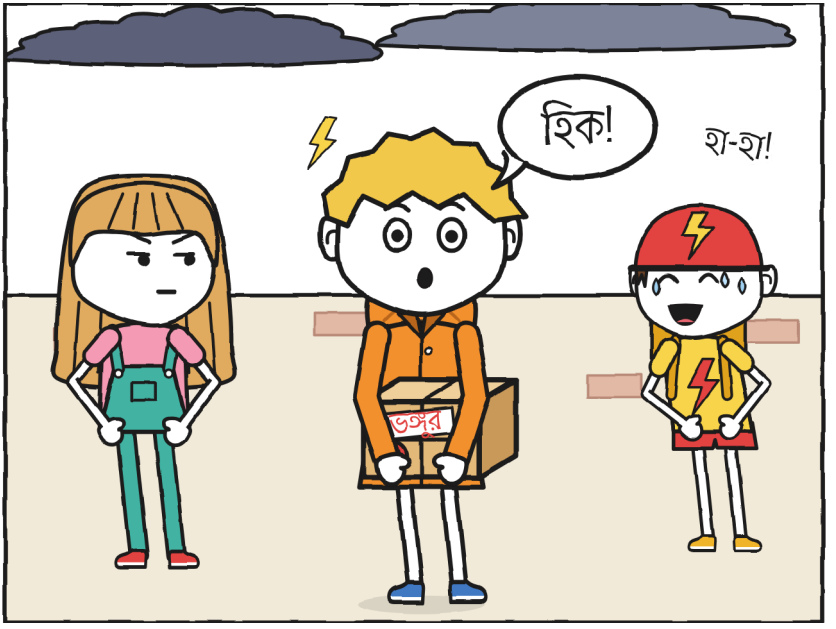
"ওটা কি হিক ছিল?" হুলিতা গতি না কমিয়েই জিজ্ঞেস করল।

"না," আমি বললাম। "হিক!"

তোনিও সাইকেলের হ্যান্ডেলের ওপর ভেঙে পড়ে এত হাসল যে সাইকেলটা একদিকে কাত হয়ে গেল। হুলিতা হাসল না। ও চোখ ছোট করে তাকাল, যেভাবে এমন কিছু পড়ার সময় তাকায়, যা লেখা নেই।

একটা মেঘের ডাক, একটা হিক: ছোটবেলা থেকেই আমার এটা হয়। ঝড় দূরে থাকলে ওটা একটাতেই থেমে যায়; মাথার ওপর থাকলে আরেকটা আসে, আর আরেকটা, তিন সেকেন্ড পরপর, যতক্ষণ না ঝড় চলে যায়। এটা ভয় নয়। এটা এমন কিছু, যা আমার শরীর আমাকে না জিজ্ঞেস করেই করে, বড় হওয়া বা হাঁচির মতো,

আর বড় হওয়ার মতোই, মুখে কোনো ভাব ফুটিয়ে এটা থামানো যায় না। আমি জানি, কারণ সব রকম মুখ করে দেখেছি।



এটার নাম ভয়। -হু.

খাল রোডে ভেরা, লাল চুলের ভেরা, ড্রাগনদের বাড়ির দরজায় আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন, যেটা ফ্লোরার দরজার গায়ে লাগানো, টুকরোকে কোলে নিয়ে। টুকরো আমাকে দেখামাত্র আমার মুখ করল: ও সবসময় এমন করে, এক সেকেন্ড আমার দিকে তাকায়, দেখে নেয় আমার কী মুখ, আর নিজেও সেটাই পরে নেয়।

আমি ২ নম্বরটা তোনিওর সাইকেলের ঝুড়িতে রাখলাম আর দু হাত বাড়িয়ে দিলাম।

"এটা ওর প্রথম ঝড়," ভেরা বললেন, আর ওকে আমার হাতে দিয়ে দিলেন। "ও তোমার সবকিছু নকল করে, শুনি। যা তুমি অনুভব করো, তা-ও। আর ভয় পেলে ওকে

টানাটানি কোরো না: ও আঁকড়ে ধরে। সব থামলে ফ্লোরার উঠোনের পাঁচিলে তিনটে টোকা দিয়ো, আমি এসে ওকে নিয়ে যাব।”

“আমি কিছুই অনুভব করছি না,” আমি জবাব দিলাম। “ঝড় আমার খুব ভালো লাগে।”

কথাটা আমি বুক ফুলিয়ে বললাম, আর আমার কোলে টুকরোও ঘাড় লম্বা করে ঠিক তেমনই বুক ফোলাল: ঝড় যার খুব ভালো লাগে, তার জীবন্ত ছবি, দুই মাপে। ভেরা আমাদের দুজনের দিকে তাকালেন, একজন আরেকজনের ওপর, একই মুখে, আর কিছু বললেন না। ভেরা কথা জমিয়ে রাখেন সেই সময়ের জন্য, যখন দরকার পড়বে।

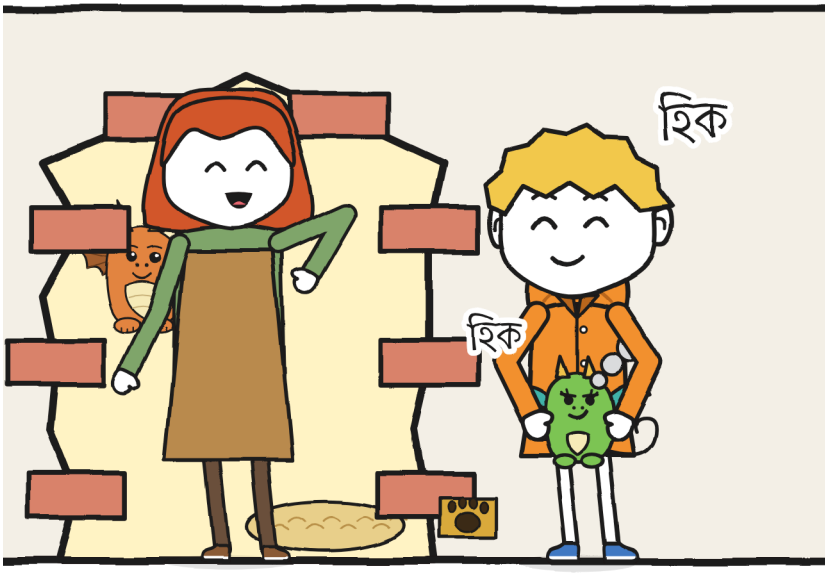
দূরে মেঘ ডাকল। আমার হিক উঠল। টুকরোরও হিক উঠল, আর ওর নাক দিয়ে ধোঁয়া বেরোল।

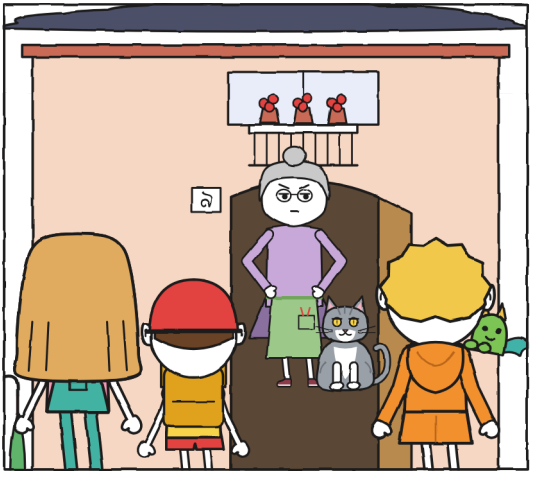
“ভেতরে, এক্ষুনি,” ভেরা থামিয়ে দিলেন, আর আমাদের ফ্লোরার দরজার দিকে ঠেলে দিলেন।

ফ্লোরার বাড়ি হলো জেরানিয়ামওয়ালা বাড়িটা, সেই বারান্দার, যেখান থেকে দুই শনিবার আগে এক ভদ্রমহিলা আমাদের দিকে তাকিয়েছিলেন, ঝারিটা শূন্যে ধরে।

উনি আমরা কড়া নাড়ার আগেই দরজা খুলে দিলেন: পাকা চুলের খোঁপা আর চশমা পরা এক ভদ্রমহিলা, গায়ে পকেটে ভরা সবুজ মালির এপ্রন, আর পায়ের মাঝখানে বুকে সাদা ছোপওয়ালা এক ধূসর বেড়াল, যে আমাদের দিকে এমনভাবে তাকাল যেন আমরা এমন এক পার্সেল, যা ওর জন্য নয়। উনি বাক্সটার দিকে তাকালেন। আকাশের দিকে তাকালেন। টুকরোর দিকে তাকালেন। এই ক্রমে, আর প্রতিটার জন্য সমান সময় দিলেন, যা বেশি ছিল না।

“ভেরার ছানা। আমার ফার্নগুলো যেন পুড়িয়ে না দেয়,” উনি বললেন। “ভেতরে এসো, বৃষ্টি আসছে। তবে বলে রাখছি: আমি পাথরে সই করি না।”


হিক
হিক





অধ্যায় ২

গুড়গুড়!

ফ্লোরার রান্নাঘর গাছে ভরা: টেবিলে, মেঝেতে, ছাদ থেকে ঝোলানো। সবার মাঝখানে কয়েকটা সরু পথ রয়েছে, যেগুলো দিয়ে হাঁটতে জানতে হয়। যে ফার্নগুলো টুকরোর পোড়ানোর কথা ছিল না, সেগুলো ঠিক ওর নাকের উচ্চতায় ছিল।

একেবারে পেছনে একটা কাচের দরজা গ্রিনহাউসে খুলেছে; আর পেছনের দরজাটা, কাঠের, ওপরে কাচ আর নিচে বেড়াল-দরজা লাগানো, উঠোনে। কাচের ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছিল পাথরের টালির ওপর বৃষ্টি শুরু হচ্ছে। ভেজা মাটির গন্ধ ছিল, যে গন্ধ আমি চিনতাম পার্ক থেকে, রান্নাঘর থেকে নয়।

গ্রিনহাউসের কাচে কিছু আঁকা ফোঁটা ছিল। একটা ফোঁটা ওপরে উঠতে শুরু করল। আরেকটা ওটাকে ছাড়িয়ে গেল।

“এগুলো র.-এর জাদু-কাচ,” ফ্লোরা বললেন। “আমি চাইলে বৃষ্টিকে ঢুকতে দেয়। বাজকে কখনও না। শব্দটা সবসময়ই ঢোকে, কী আর করা।”

কথাটা আমি র.-এর কার্ডের জন্য রেখে দিলাম: উনি জাদু-কাচ বানাতে জানতেন, আর তেইশবার চেষ্টা করেও একটা বয়াম পৌঁছে দিতে পারেননি।

ফ্রিজে একটা চুম্বক একটা ছবি ধরে রেখেছিল। আর সিংকের পাশে একটা পেরেক থেকে, একটা কড়াই আর শুকনো ভেষজের এক আঁটির মাঝখানে, দুটো

হাতলওয়ালা স্টিলের ছাঁকনি ঝুলছিল। ঢুকেই আমি ওটা দেখেছিলাম, গাছগুলোর আগে: মানুষ ঠিক সেটাই চট করে দেখে, যেটা সে এক সপ্তাহ ধরে ভুল বাক্সে খুঁজছে।

তোনিও বৃষ্টির জন্য সাইকেলটা প্যাসেজে ঢুকিয়ে দিল, আর ওর পাশেই রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে রইল, অর্ধেক শরীর ভেতরে: যে জায়গা ওর নয়, তোনিও সেখানে এভাবেই ঢোকে। বেড়ালটা ওর পায়ের ফাঁক দিয়ে গেল, আর তোনিও দরকারের চেয়ে বেশি সরে গিয়ে ওকে জায়গা দিল। আমি ভাবলাম, ও চায় না কেউ ওর সাইকেল ছুঁয়ে যাক।

ফ্লোরা বাক্সটা টেবিলে রাখলেন, কনুই দিয়ে দুটো টব সরালেন, আর কিছু না জিজ্ঞেস করেই খুলে ফেললেন। জিজ্ঞেস না করে, আর লেবেলও না পড়ে: অনেকবার খোলা বাক্সের কার্ডবোর্ড ঠিক কোথায় নরম হয়, উনি জানতেন। ভেতরে খড়ের মধ্যে ছিল কর্কের ছিপি-আঁটা একটা কাচের বয়াম, আর বয়ামে আটটা ধূসর গুটি।

“লেখা আছে মেঘ ডাকার আগে খোলা যাবে না!” হুলিতা চেঁচিয়ে উঠল।

হুলিতা আঙুল দিয়ে লেবেলটা দেখাল। মারার তৃতীয় শর্ত টিকেছিল ঠিক ততক্ষণ, যতক্ষণ একজন ভদ্রমহিলার একটা ঢাকনা তুলতে লাগে।

“আজ আমি বাক্স খুলেছি, বয়াম নয়,” ফ্লোরা বললেন। “ভেতরে কী আছে আমি জানি: র. আমাকে লণ্ঠন-গাছের কথা দিয়েছিলেন, আর পাঠান পাথর।”

কথাটা শোনাল পুরোনো অভিযোগের মতো, যে ধরনের অভিযোগ আর কাউকে শোনানোর জন্য বলা হয় না, বলা হয় কারণ বলার পালা এসেছে। আমি বয়ামটার দিকে তাকালাম। গুটিগুলো ধূসর, মসৃণ, ছোট ছোট আখরোটের মতো, আর এমন স্থির, যেমন শুধু পাথরই স্থির থাকে। ওরা যে পাথর নয়, তা আমি বলতে পারতাম না। খাতায় বয়ামের পাশে আমি একটা তীর আঁকলাম: “পাথর?”। কেউ আরেকটা যোগ করল, সবুজে: “লণ্ঠন-গাছ?”

“লণ্ঠন-গাছ কী?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

আমি যে লণ্ঠনগুলো চিনতাম, সেগুলো ছিল কাগজের, রঙিন, উৎসবের সময় দুই বারান্দার মাঝে দড়িতে ঝোলানো; প্রথম বৃষ্টি পর্যন্ত টিকত। কিন্তু সিলমোহর লাগিয়ে কেউ পাথর পাঠাবে, এটাও আমার ঠিক মনে হলো না।

“বিজলিতে পাথরের দাম কিলো ধরে,” তোনিও দরজা থেকে বলল।

কেউ ওর কথায় কান দিল না। ও নিজেও না।

ফ্লোরা ফ্রিজের কাছে গিয়ে চুম্বকের নিচ থেকে ছবিটা খুলে আনলেন, আর আমাদের সামনে, বয়ামের পাশে, টেবিলে রাখলেন।



ছবিটা পুরোনো: খালপাড়ের পথ, রাতে, পাড় ধরে নিচু নিচু গোল ছোট ছোট আলোর সারি, একটার পেছনে আরেকটা, সাঁকোর শুরু পর্যন্ত। ওগুলো রাস্তার বাতি নয়: মাটি ফুঁড়ে উঠেছে, যেন কেউ বাল্‌ব পুঁতে দিয়েছে। সামনের দিকে, পিঠ ফিরিয়ে, দুজন মানুষ কিছু একটা পুঁতছিলেন: একজনের খোঁপা; তাঁর পাশে এত বড় খড়ের টুপি, যে যিনি তার নিচে ছিলেন, তাঁকে দেখা যাচ্ছিল না। আমি টুপি নিয়ে প্রশ্ন করলাম না। ফ্লোরাও টুপির কথা কিছু বললেন না। দুটো নীরবতার মাঝখানে একটা গোটা মানুষ ঢুকে যেত।

“এগুলো গাছ, যারা বিদ্যুৎ-চমকের আলো জমিয়ে রাখে আর সারা রাত আলো দেয়,” ফ্লোরা বললেন। “বীজগুলো আনতেন র., আগেই জাগানো, ঝড়ের রাতে; আমি মাটি দিতাম। ঘুমন্ত বীজ কখনও দেখিনি। লণ্ঠন-গাছগুলো একটা একটা করে নিভে গেল, আর র. আর আসেননি: এখন এই বয়ামটা পাঠান।”

ফ্লোরা ছবিটা আবার ফ্রিজে লাগিয়ে দিলেন। বেঁকে গেল। উনি এক আঙুলে সোজা করলেন, আর আরেকটু সময় ওখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন।

সেজন্যই খালটা এত অন্ধকার ছিল। সাঁকোর আলোগুলো নিভে গিয়েছিল আর কেউ আর জ্বালায়নি। সেজন্যই ওটাকে এত ভয় লাগে।

ধরাত। আমাকে তো খুবই: আমি অন্ধকারে ওটা পার হয়েছি। -হু.

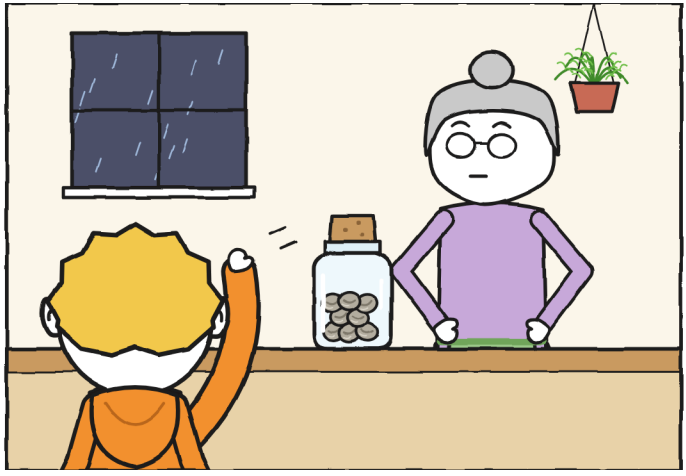
ভুলিতা এই নোটটা লিখল ফ্রিজের ছবি থেকে চোখ না সরিয়ে। সাঁকো হলো খালের ওপর সেই তক্তা, যেটা আমরা দুই শনিবার আগে পার হয়েছিলাম, ও পিঠ ফিরিয়ে আর আমি ওকে বলে দিচ্ছিলাম কোথায় পা ফেলতে হবে।

“র. সবসময় কথা রাখেন,” ফ্লোরা বললেন। “দেরিতে, কিন্তু রাখেন। এবার ওঁর ভুল হয়েছে।”

আমি কথা দুটো আলাদা একটা কার্ডে টুকে রাখলাম, যে কার্ডটায় তালিকা বড় হতে থাকে: র. সম্পর্কে যা জানি, যার ছবির জায়গায় আছে একটা প্রশ্নচিহ্ন। তাতে দুটো লাইন ছিল, দুটোই ১ নম্বর খাতা থেকে: মারার মতে ওঁর হাতের লেখা খারাপ, আর ওঁর নামের প্রথম অক্ষর পড়ে ভেরার মুখের ভাব। জাদু-কাচের লাইনটা নিয়ে সেদিন বিকেলে আরও তিনটে যোগ হলো, আর ছবিটা আগের মতোই রইল।

“আর আপনি কি কখনও মেঘ ডাকার পরে ওটা খুলেছেন?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

ফ্লোরা চশমার ওপর দিয়ে আমার দিকে তাকালেন। প্রশ্ন করার জন্য যে হাতটা তুলেছিলাম, কেন যেন, সেটা নামিয়ে ফেললাম।



“আমি কারও জন্য অপেক্ষা করি না,” উনি বললেন। “মেঘ ডাকার জন্যও না।”

হুলিতা না বুঝেই মাথা নাড়ল। আমি খেয়াল করলাম, আর চুপ করে রইলাম।



ফ্লোরার বেড়ালের নাম গুড়গুড়। ওর নীল বাটিতে সাদা অক্ষরে লেখা, বেড়াল-দরজার পাশে, আর আমি খাতায় টুকে নিলাম, বাটির একটা ছবি সমেত, গোটা গোটা অক্ষরে, কারণ পরে এটা কাজে লাগে: গুড়গুড়। যা কিছু আমাকে ভয় দেখাতে পারে, তার সবকিছুর নাম আমি লিখে রাখি; এটা শিখেছি একটা পার্সেলের কাছ থেকে, যার দাঁত বেরোল। ও বৃষ্টির মেঘের মতো ধূসর, বুক সাদা, চোখ হলুদ, আর ফ্রিজের পাশে শুয়ে যখন গরগর করে, এত নিচু আর এত একটানা, যে মনে হয় দূরের একটা মেঘের ডাক, যেগুলো এখনও হিক তোলায় না।

অপেক্ষার সময় রান্নাঘরে সবকিছু ঘটল, আবার কিছুই ঘটল না।

হুলিতা বয়ামের পাশে টেবিলে আঙুল দিয়ে টোকা দিচ্ছিল, টক, টক, টক, এমন একজনের ছন্দে, যে ছয়বার আবহাওয়ার খবর দেখেছে আর এখন শুধু চায় ঝড়টা শুরু হোক। ফ্লোরা একটা বিস্কুটের টিন খুললেন আর মাঝখানে রেখে দিলেন, “নাও” না

বলেই; বোঝা গেল। তোনিও, যে এর জন্যও হেলমেট খোলেনি, একটা বিস্কুট কামড়াচ্ছিল, এমন সময় দূরে মেঘ ডাকল, গুরুরুম, যা প্রায় ডাক ছিলই না। আমার হিক উঠল। টুকরোর হিক উঠল, আর ওর মুখ থেকে একটা ছোট্ট শিখা বেরিয়ে তোনিওর বিস্কুটের সামনে দিয়ে গেল, আর বিস্কুটটা সোনালি করে দিয়ে গেল। তোনিও ওটার দিকে তাকাল, শুঁকল, আর তবু খেয়ে নিল।

ফ্লোরা কিছু না বলে আগে থেকে তৈরি রাখা এক বালতি জল টেনে এনে টুকরোর পাশে মেঝেতে রাখলেন। আর গুড়গুড়, যে এতক্ষণ ভান করছিল আমরা নেই, টুকরোকে দেখল, ওর পিঠের পুরো লোম খাড়া হয়ে গেল, আর লেজ ফুলিয়ে ওর সামনে এসে দাঁড়াল। টুকরো আমার পায়ের পেছনে লুকোল। আমি, না বুঝেই, হুলিতার পেছনে লুকোলাম। আমরা সারি বেঁধে রইলাম: একটা বেড়াল, একটা ছানা, একটা ছেলে আর টেবিলে আঙুল রাখা একটা মেয়ে, যে নড়ল না।

মেঘ ডাকার চেয়েও খারাপ হলো তার অপেক্ষা। -হু.

ঝড় এগিয়ে আসছিল। জানালায় টের পাওয়া যাচ্ছিল, যা ব্ল্যাকবোর্ডের রং ধরছিল, আর বয়ামেও টের পাওয়া যাচ্ছিল: গুটিগুলো, যেগুলো এতক্ষণ পাথরের মতো স্থির ছিল, কাচে ঠোকাঠুকি করতে শুরু করল, একটা মিহি টুং, যেটা প্রথমে ভেবেছিলাম বৃষ্টি, তারপর আর না। ক্রমেই জোরে। যেন বয়ামের ভেতরেও ওরা গুনছে। পাথর গোনে না। কথাটা ভাবলাম আর বললাম না: ফ্লোরা এর মধ্যেই একবার চশমার ওপর দিয়ে আমার দিকে তাকিয়েছেন।

হুলিতা প্রতিটা বিদ্যুৎ-চমকের সঙ্গে নিচু গলায় গুনছিল: "বারো হাতি।" "নয়।" সংখ্যাগুলো নামছিল। আর প্রতিবার নামার সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের নিচে ওর পা আরও নড়ছিল, মেঝেতে ঠকঠক করে, কোনো কিছুর ছন্দে নয়। আমি যেখানে ছিলাম সেখান থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম। ওকে বললাম, মেঝেতে ও গর্ত করে ফেলবে; ও জবাব দিল যে ও গুনছে। হুলিতাকে কেউ বোঝাতে পারে না যে ওর একটা পা আছে।

তখন টুকরো আরেকটা ছোট্ট শিখা ছাড়ল, হিক ছাড়াই, নিছক স্নায়ুর চাপে, আর গুড়গুড়, যে এক বিঘত দূরে ছিল, তির খেয়ে বেরিয়ে গেল বেড়াল-দরজা দিয়ে, উঠোনে,

বৃষ্টিতে, ঢাকনা পড়ার শব্দ করে: খটাস। ফ্লোরা পেছনের দরজা এক টানে খুলে দোরগোড়া থেকে ওকে ডাকলেন, ওঁর সবটুকু গলায়, যা অনেকটা:

“গুড়গুড়ঊঊঊ!”



কেউ জিজ্ঞেস করলে বলব, চিৎকারের আগেই হুলিতার হাত ছিপিতে ছিল। কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করেনি।

আর হুলিতা বয়ামটা খুলে ফেলল।

ফটাস!

শব্দটা ছোট আর গোল, কর্কের, আর স্পষ্ট শোনা গেল, কারণ রান্নাঘরে আধ সেকেন্ডের জন্য আর কোনো শব্দ ছিল না। হুলিতা ছিপিটা তুলল ঠিক সেই মুখ নিয়ে, যে নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে মেনেছে।

“মেঘ ডেকেছে!” ও বলল।

মেঘ ডাকেনি। ফ্লোরা চেঁচিয়েছিলেন। গুড়গুড় হলো বেড়ালটা।

আমার হিক উঠেছিল, অবশ্য। মেঘ ডেকেছিল বলে নয়: কেউ আমার দুই মিটারের মধ্যে "গুড়গুড়" বলে চেঁচিয়েছিল বলে, আর আমার শরীর তফাত বোঝে না। টুকরোর হিক উঠল শিখা সমেত, আর তোনিও দুই হাতে কান ঢাকল, দেরিতে।

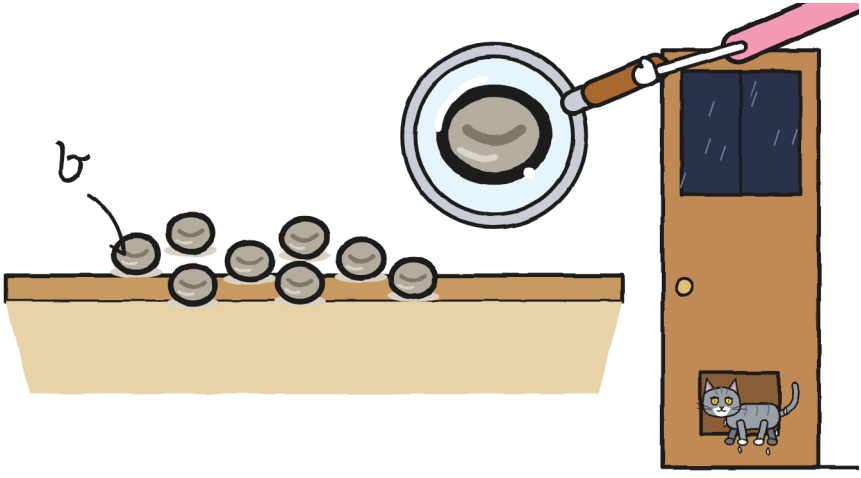
বেড়ালটার ব্যাপারটা আমি একটু আগেই টুকে রেখেছিলাম, বাটির ছবির পাশে, সাদা অক্ষর সমেত, যাতে পরিষ্কার থাকে।

ওই পাতাটা আমি পরে পড়েছি। -হু.

বয়ামের ভেতরে শুধু আটটা ধূসর গুটি ছিল, ঠান্ডা আর স্থির। কিছু জ্বলে উঠল না, কিছু লাফাল না, কিছু টুং করল না। হুলিতা, যে প্রথম ধাক্কায় হার মানার মেয়ে নয়, ওগুলো সাবধানে টেবিলে ঢালল আর ডাঙ্গারির পকেট থেকে আতশি কাচ বের করল। আমি আঙুল দিয়ে গুনলাম: আট। কী করতে হবে না জানলে আমি এটাই করি। গোনা।

"ওদের একটা সরু দাগ আছে," ও বলল। "বোজা চোখের মতো।"

আমি আতশি কাচে তাকালাম, ধার করে। প্রতিটা গুটির গায়ে ছিল অতি সরু, বাঁকানো একটা দাগ। দেখতে চোখের পাতার মতো।



গুড়গুড় একা ফিরে এল বেড়াল-দরজা দিয়ে, ভিজে চুপসে, লোম লেপটে, অর্ধেক সাইজের হয়ে, আর ঝাড়া দিল ঠিক টুকরোর বালতির ওপর, যেটা ততক্ষণে ভরে গেছে। ফ্লোরা পেছনের দরজা বন্ধ করলেন, এপ্রনে হাত মুছলেন আর টেবিলের দিকে তাকালেন।

"এগুলো পাথর," উনি বললেন। "আর কেউ মেঘ ডাকার আগে বয়ামটা খুলে ফেলেছে।"

কথাটা বলার সময় উনি হুলিতার দিকে তাকালেন না। দরকারও ছিল না। হুলিতা নিজের টি-শার্টের রঙের হয়ে গেল, গোলাপি, আর আতশি কাচটা খুব ধীরে পকেটে রাখল, যেন ধীরে রাখাটাই কিছু না-খোলার একটা উপায়।

গাছপালা নিয়ে আমি বেশি কিছু জানি না। তুলোয় একটা মসুর ডাল পুঁতেছিলাম, বাড়ি বদলে সেটা বাঁচেনি। কিন্তু ফ্লোরা বলেছিলেন "ঘুমন্ত বীজ কখনও দেখিনি", আর ওই বন্ধ দাগগুলোর কথা ভাবা আমি থামাতে পারছিলাম না।

"ওরা ঘুমিয়ে আছে," আমি বললাম। "পাথর নয়: বীজ। সেজন্যই তো লেখা 'মেঘ ডাকার আগে খুলবেন না'। হয়তো একটা মেঘের ডাক ওদের জাগিয়ে দেয়। একটা মোটা ডাক, যেগুলো কাচ কাঁপিয়ে দেয়।"

একটা ঘুমন্ত বীজ হলো পরিকল্পনাওয়ালা একটা পাথর।

ফ্লোরা বসলেন, আমরা আসার পর প্রথমবার। গুটিগুলোর দিকে তাকালেন। তারপর বললেন:

"যদি বীজ হয়, তাহলে ওরা প্রমাণ করুক।"

বাইরে প্রায় রাত হয়ে এসেছিল। ছটা বেজেছিল। যে সময়টা হুলিতা ছয়বার দেখেছিল।



বিদ্যুৎ-চমক সবকিছু সাদা করে দিল।

কোনো সতর্কসংকেত ছিল না। এক মুহূর্ত আগে রান্নাঘর ছিল রান্নাঘর, তার গাছ, তার ফ্রিজ আর ভেজা বেড়াল নিয়ে, আর পরমুহূর্তে সেটা হয়ে গেল রান্নাঘরের সাদাকালো আঁকা এক ছবি: প্রতিটা পাতা কাটা, আমাদের প্রত্যেকের ছায়া দেয়ালে সেঁটে, জানালা একটা আলোর পাতা। হুলিতা গোনার জন্য মুখ খুলল, আর শুধু "এক হা..." বলার সময় পেল।

আর তারপর এল আসলটা।



মেঘের ডাক এল বিদ্যুৎ-চমকের সঙ্গে একই সময়ে: ঝড় ঠিক মাথার ওপর। ওটা শব্দ ছিল না; ওটা ছিল ধাক্কা। টেবিল, গ্লাস আর কাচ কেঁপে উঠল, আর আমার ভেতরে এমন কিছু কাঁপল, যা হাতির হিসেবের ছকে নেই। শূন্য হাতি। ঠিক মাথার ওপর।

আর আলো চলে গেল।

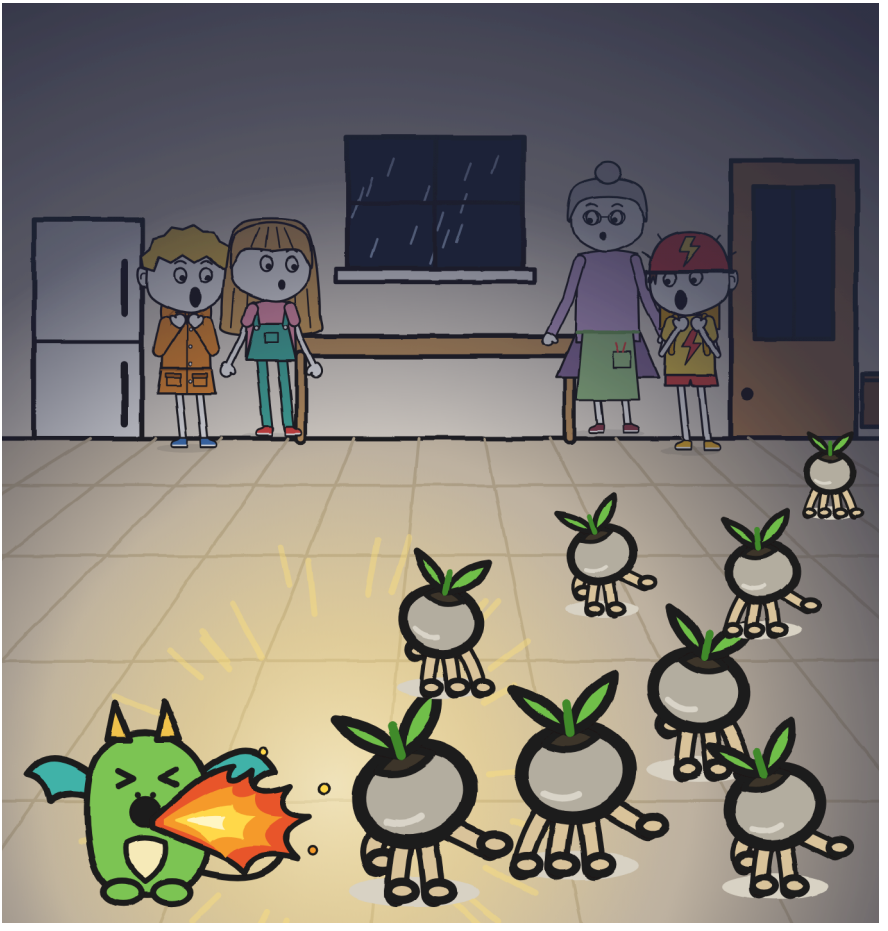
পুরোপুরি চলে গেল, ফ্রিজের সেই খট শব্দ করে, যে গুঞ্জন থামালে হয়, আর রান্নাঘর কালো হয়ে গেল বন্ধ বাক্সের তলার মতো। শুধু চোখ ছিল: আমার, যেগুলো টের পাচ্ছিলাম প্রয়োজনের চেয়ে বেশি খোলা, অন্যদের, আর আমার বুটের গায়ে ঠেকে থাকা হলুদ দুটো। কেউ কিছু বলল না। কাচে বৃষ্টির শব্দ শোনা যাচ্ছিল, আর অনেক নিচে ছোট, দ্রুত একটা নিশ্বাস, যা আমার নিশ্বাসের তালে চলছিল।

আমার হিক উঠল।

টুকরোর হিক উঠল, আর ওর মুখ থেকে বেরোল আগুনের হলকা।

এক সেকেন্ডের জন্য পুরো রান্নাঘরটা দেখা গেল।

টেবিল খালি ছিল।



পাথরগুলোর পা ছিল।



অধ্যায় ৩

না দেখলেই ওরা নড়ে

অন্ধকারে ছোট্ট একটা বৃষ্টির শব্দ শোনা যাচ্ছিল: টুক, টুক, টুক। বাইরের বৃষ্টি ঝরছিল। এটা মেঝে বেয়ে ছুটছিল।

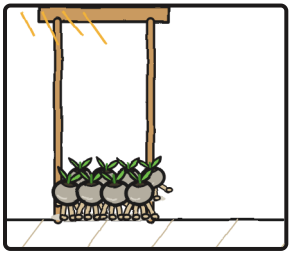
বিদ্যুৎ-চমক।

বীজগুলো আরও দূরে। স্থির, তাদের চার পা আর দুটো পাতা নিয়ে। একটা বীজ একটা পা শূন্যে তুলে রেখেছিল। ওর মুখের ভাব ঠিক আমার মতো, মা যখন জিজ্ঞেস করে কে কী ছুঁয়েছে।

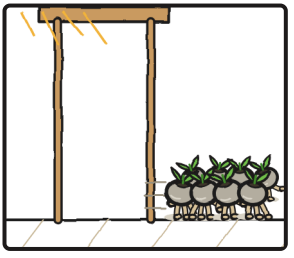
আবার অন্ধকার: টুক, টুক, টুক।

আমার হিক উঠল। টুকরোর হিক উঠল। ওর আগুনের হলকা তিনটে বীজকে আধ-পা অবস্থায় ধরে ফেলল। বাকিরা ছুটেই চলল।

এটা স্ট্যাচু খেলা। বীজ দিয়ে। -হু.







ফ্লোরা টর্চ জ্বালালেন। একটা বীজের দিকে ধরে ওটাকে পেরেকে গেঁথে ফেললেন। আরেকটার দিকে ধরলেন। প্রথমটা পালাল।

“ওগুলো বীজ! জেগে আছে!”

উনি রাগী গলা করতে ভুলে গিয়েছিলেন।

“আমি তো সেটাই বলেছিলাম,” আমি বিড়বিড় করলাম।

“তাহলে সাহায্য করো, যাতে ওরা পালাতে না পারে।”

হুলিতা ঝুঁকে বসল। ওর এক হাতে তখনও ছিপিটা। ওটা ডাঙ্গারিতে রেখে দিল আর একটা বীজের সামনে অন্য হাত খুলে ধরল।

এক আঙুলের জন্য ফসকে গেল।

পরের বিদ্যুৎ-চমকে আমরা দেখলাম ওরা কোথায় যাচ্ছে: সবাই বেড়াল-দরজার দিকে।

ফ্লোরা একটা বিশাল টব টেনে এনে ওদের পথ আটকে দিলেন।

“ওরা ঝড়ের ভেজা মাটি খুঁজছে। এখানে শুধু কলের জলের মাটি। বাইরে প্রায় কোনো মাটিই নেই: আছে টালি, একটা সরু পথ আর খাল। বেরোলে বৃষ্টি ওদের ধুয়ে জলে নিয়ে যাবে।”

আমি কাচের ভেতর দিয়ে তাকালাম। সুতোর মতো চারটে পা নিয়ে একটা বীজ ওখানে টিকত ততক্ষণ, যতক্ষণ জলের ডোবায় একটুকরো কাগজ টেকে।

বেড়াল-দরজা বন্ধ হলো। কিন্তু এখন ওরা ছড়িয়ে ছিল গোটা রান্নাঘরে, অন্ধকারে, আর রান্নাঘরে লুকোনোর শ'খানেক জায়গা আছে: ফ্রিজের নিচে, বালতির পেছনে, টবের ফাঁকে, ঝারির ভেতরে, আর টেবিলের নিচে, যেখানে আমি ছিলাম, মাথায় ফ্লোরার ছাঁকনি পরে। আমার বাড়িতে মেঘ ডাকলে আমি একটা পরি; এটা ঝুলছিল সিংকের পাশে একটা পেরেক থেকে, আর আমার হাত দুটো নিজে নিজেই ওটা নামিয়ে এনেছিল।

আমরা সবরকম চেষ্টা করলাম:

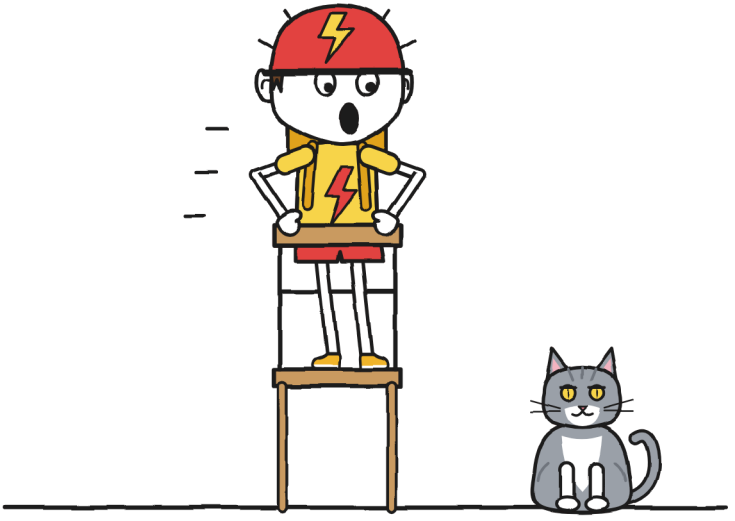
১. হুলিতা একটা বীজের ওপর কাপড় ছুড়ে দিয়ে নিজে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, কাপড় তুলল, আর নিচে ছিল... গুড়গুড়। ম্যাঁউউ! ও কাপড়ের ভেতর থেকে বেরোল, যেভাবে বেড়াল সব জায়গা থেকে বেরোয়: ভীষণ অপমানিত, আর ঠিকই।
২. তোনিও চেয়ারের নিচ দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে একটার পেছনে ছুটল, আর গুড়গুড়, যে জানে না ডেলিভারি-বয় কী জিনিস, ওর পিঠে চড়ে বসল আর সেখানেই রইল, যাত্রায় মহা খুশি। সরো!
৩. আমি টেবিলের নিচে হিক করলাম। টুকরোর হিক উঠল, আর ওর আগুনের হলকা হুলিতার হাত থেকে দুই বিঘত দূরে একটা বীজকে স্থির করে দিল, আর হুলিতা ওটা ধরে ফেলল। "একটা!"
৪. ফ্লোরা টর্চের আলো আরেকটার ওপর গেঁথে ওটা তুলে নিলেন, ঠিক সেই শান্ত ভঙ্গিতে, যেভাবে মেঝে থেকে একটা বরই তুলে নেওয়া হয়। "দুটো!"

গুড়গুড়ও ওদের তাড়া করছিল। ও প্রায় অন্ধকারেও দেখতে পায়। আমরা পারি না। আমরা বাকিরা যখন চেয়ারে হোঁচট খাচ্ছিলাম আর হাতড়ে হাতড়ে একে অপরের কাছে মাফ চাইছিলাম, গুড়গুড় মাঝখান দিয়ে কিছু না ছুঁয়ে চলে যাচ্ছিল, আর বোঝা যাচ্ছিল ও খেলছে অন্য লিগে।

তোনিও ঝড়কে ভয় পায় না। তোনিও ভয় পায় বেড়ালকে।

আমরা আবিষ্কার করলাম যখন গুড়গুড় ওর পিঠ থেকে নেমে গেল, আর তোনিও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলার বদলে একটা চেয়ারে উঠে গেল আর সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল, কাঠ হয়ে, হেলমেট মাথায়, পা দুটো মেঝে থেকে যতটা দূরে রাখা যায়। গুড়গুড় নিচে বসল, নির্বিকার, আর ওকে দেখতে লাগল শো-কেসের জিনিসের মতো।

"ওটা বেড়াল নয়!" হুলিতা ওকে বলল। "ওটা গুড়গুড়!"



“আরও খারাপ!”

আমি এটা লিখছি হাসি ছাড়া, কারণ আমার সে অধিকার নেই। তোনিওর ভয়টা চেয়ারের ওপর উঠে ছিল, যেখানে সবাই দেখতে পাচ্ছিল। আমারটা ছিল একটা টেবিলের নিচে, একটা ছাঁকনির সঙ্গে।

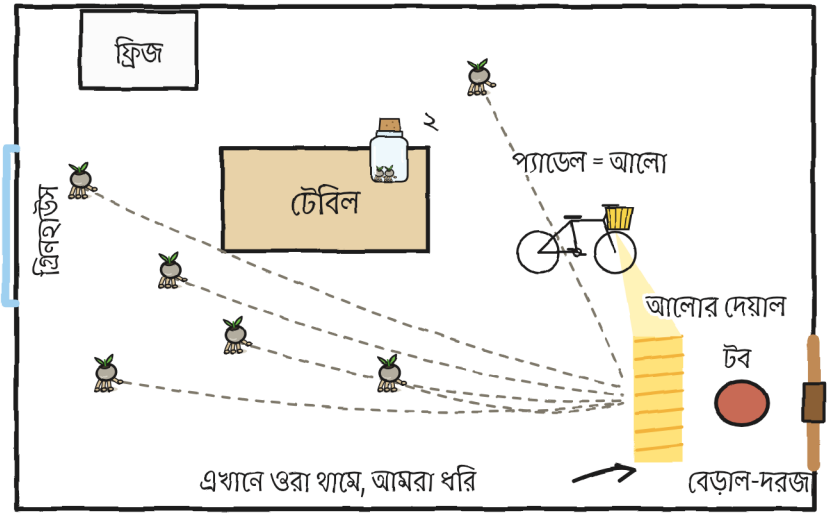
টেবিলের তলার প্রফেশনাল। -হু.



ওই নিচ থেকে, প্রতিটা বিদ্যুৎ-চমকে আমি পুরো মেঝেটা দেখতে পাচ্ছিলাম। বীজগুলো চেয়ারের ফাঁকে ফাঁকে ঘুরছিল, কিন্তু সবসময় ফিরে আসছিল বেড়াল-দরজার টবটা ঠেলতে। বেশি জোরে ঠেলছিল না। কিন্তু ঠেলছিল সবসময়।

তাই আমি একটা ম্যাপ আঁকলাম।

আমি ওটা এঁকেছিলাম বিদ্যুৎ-চমকে চমকে, প্রতি চমকে একটা দাগ, হাঁটুর ওপর খাতা রেখে: তাড়াতাড়ি ভাবার একমাত্র উপায় যা আমি জানি। এরকম ম্যাপের দাগগুলো বাঁকা, কিন্তু তীরগুলো সব একই জায়গায় যায়, আর সেটাই ছিল জরুরি। বেড়াল-দরজার সামনে আমি লিখলাম "আলোর দেয়াল", আর তার পাশে একটা সাইকেল: প্যাডেল করা = আলো।



"তোনিও, তোমার হেডলাইট কি প্যাডেল করলে জ্বলে?"

"অবশ্যই।"

"তাহলে আজ তুমি আলো ডেলিভারি করবে।"

ফ্লোরা ম্যাপে আলো ফেললেন। হুলিতা টেবিলক্লথের নিচ দিয়ে উঁকি দিল। তোনিও চেয়ার থেকে নামল: নিজের সাইকেলের জন্য ও যেকোনো জায়গা থেকে নেমে আসে।

আমরা সাইকেলটা ওর স্ট্যান্ডে দাঁড় করালাম, হেডলাইট বেড়াল-দরজার দিকে। বিজলির ডায়নামো লাগানো থাকে পেছনের চাকার গায়ে: ঘুরলে আলো জ্বলে। আর তোনিও প্যাডেল করল।

ও প্যাডেল করল যেমন আগে কখনও করেনি। বিশেষ করে যখন গুড়গুড় ওর ওপর চড়ে বসল।

দেখতে না পারলে বোঝা যায় না, আর সেজন্যই আমি ছবিটা এঁকেছিলাম।



একটা সাইকেল, যেটা কোথাও যাচ্ছিল না, চালাচ্ছিল এমন একজন, যে অনেক দূরে থাকতে পারলেই বাঁচত। আলো বেরোল হেডলাইট থেকে, প্রথমে হলুদ আর কাঁপা-কাঁপা, তারপর সাদা আর সোজা, আর বেড়াল-দরজার সামনে দেয়ালের মতো দাঁড়িয়ে গেল। ওটা ছিল আমার আলোর দেয়াল, বাস্তবে, ঘামের ফোঁটা সমেত।

বীজগুলো আলোর কাছে এসে স্থির হয়ে যাচ্ছিল, আর আমরা এক এক করে ওদের ধরে বয়ামে ভরছিলাম। তিন। চার।

আমি টেবিলের নিচ থেকে বেরিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে হুলিতার পাশে, আলোর কিনারায় গেলাম। বীজগুলো দাগটা মাড়িয়েই থেমে যাচ্ছিল। ওরা মার্বেলের চেয়ে সামান্য ভারী ছিল। আঙুল তাড়াতাড়ি বন্ধ করতে হতো: ছায়া ছুঁতে না ছুঁতে ওরা আবার চেষ্টা শুরু করত।

গুড়গুড় মুখে করে আরেকটা ধরে ফেলল, আর ফ্লোরা দুই আঙুলে ওর কাছ থেকে নিয়ে নিলেন।

“পাঁচ!” উনি বললেন।

ছয়।

হুলিতা ডাঙ্গারি থেকে ছিপিটা বের করল আর ফ্লোরা বয়ামের মুখ বন্ধ করলেন, কর্ক শক্ত করে এঁটে, যাতে ছটা বীজ আবার কিছু ভাবার সুযোগ না পায়। তারপর উনি আমাদের সাহায্য করতে নিচু হলেন। তখনই গুড়গুড় টেবিলে লাফিয়ে উঠে ওটা ফেলে দিল।

আমি চোখের কোণ দিয়ে ওটা পড়তে দেখলাম, ধীরে ধীরে: কর্কের ছিপি-আঁটা বয়ামটা, বাতাসে একটা গোটা পাক খেয়ে। আর দেখলাম তোনিও প্যাডেল ছেড়ে দিয়ে, গোলকিপারের মতো টান টান হয়ে সাইকেল থেকে ঝাঁপ দিল আর মেঝের এক বিঘত ওপরে দুই হাত বন্ধ করল। ঝপ!



“বিজলি,” ও বলল, টালির ওপর শুয়ে, বয়াম মাথার ওপর তুলে ধরে। “এক সেকেন্ডে, নইলে বিনামূল্যে।”

আমার জীবনে দেখা সবচেয়ে দ্রুত ডেলিভারি ছিল এটা। কথাটা আমি এখানে খাতায় স্বীকার করছি, কারণ জোরে বলা আমার দ্বারা হয়নি: আমার মুখ দিয়ে যা বেরোল তা একটা হিক।

কিন্তু ও প্যাডেল করা থামিয়ে দিয়েছিল, আর আলো নিভে গেল। আর গুড়গুড়কে থামানো যায় না: ও তির খেয়ে ছুটল বেড়াল-দরজার দিকে।

অন্ধকারে: টুক, টুক, টুক। তারপর, ক্যাঁচ: টবটা সরে গেল, একটা বেড়ালের ধাক্কায়, যে বেরোতে চাইছিল আর বেরিয়েও গেল। খটাস: বেড়াল-দরজা। আর পেছন পেছন, খুব তাড়াতাড়ি, আরেকটা টুক, টুক, টুক, যেটা গুড়গুড় ছিল না।

যখন আবার বিদ্যুৎ চমকাল, মেঝেতে একটাই বীজ পড়ে ছিল, আর হুলিতা ওটা ধরে ফেলল। ফ্লোরা বয়ামের মুখ ঠিক যতটুকু খুললে ওটা ঢোকে ততটুকু খুললেন, আর আবার কর্কটা এঁটে দিলেন। সাত।

ওই একই বিদ্যুৎ-চমকে আমি দরজার কাচের ভেতর দিয়ে দেখলাম: বৃষ্টির নিচে চকচকে টালির উঠোন, সরু পথটা, আর সরু পথের ঠিক মাঝখানে খুদে একটা বীজ, আধ-পায়ে থেমে, ছোট্ট পাতা দুটো জলে নুয়ে। তারপর আবার রাত হয়ে গেল। আর পরের বিদ্যুৎ-চমকে সরু পথে আর কিছু ছিল না।

আট নম্বরটা বেড়াল-দরজা দিয়ে চলে গিয়েছিল।



“আমি ওটা আনতে যাচ্ছি!” হুলিতা বলল, হাত ইতিমধ্যে দরজার হাতলে।

“বাজ পড়ার মধ্যে এই বাড়ি থেকে কেউ বেরোবে না,” ফ্লোরা মীমাংসা করে দিলেন। তর্কের মেজাজে উনি ছিলেন না।

ফ্লোরা দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন, কাচের দিকে পিঠ দিয়ে, দুই হাত ছড়িয়ে। হুলিতা ওঁর কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল: সরু পথ, খাল, বৃষ্টি। চোয়াল শক্ত করল।

হুলিতা তর্ক করল না। কিন্তু হাতলটাও ছাড়ল না।

কিছুক্ষণ পরে বেড়াল-দরজায় খটাস শব্দ হলো। গুড়গুড়, দ্বিতীয়বার ভিজে চুপসে, লোম লেপটে, আর মুখে এমন ভাব, যেন জীবনে কোনো টব সরায়নি। একা এসেছে। আট নম্বর ছাড়া। ফ্লোরা পায়ে করে টবটা আবার বেড়াল-দরজার কাছে ঠেলে

দিলেন, যদি দরকার হয়, আর গুড়গুড় গিয়ে টেবিলের নিচে বসল, যেন ঝড়টা আমাদের ব্যাপার।



কিছুক্ষণ কেউ কিছু বলল না; শুধু আমি, আর আমার বলাটা ছিল হিক। বাইরে আকাশ আবার জ্বলে উঠল।

“বিদ্যুৎ-চমক... এক হাতি, দুই হাতি।”

গুরুরুম।

“দুই,” হুলিতা শুনল। “এখনও খুব কাছে।”

কথাটা ও বলল দরজার হাতলে হাত রেখে, দরজার দিকে তাকিয়ে, আমাদের দিকে নয়। দুই হাতি মানে এক কিলোমিটারেরও কম। এক ঘণ্টা আগে পর্যন্ত আমার কাছে এটাই হতো রাতের সবচেয়ে খারাপ খবর; এখন এটা দ্বিতীয়।

“তাহলে এবার ওদের পুঁততে হবে,” ফ্লোরা বললেন। “ঝড় চলে যাওয়ার আগেই। আর অন্ধকারে।”

“বাজ পড়ার মধ্যে?” হুলিতা জিজ্ঞেস করল, হাতল না ছেড়েই।

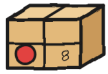
ফ্লোরা গ্রিনহাউসের কাচ বেয়ে ওঠা ফোঁটাগুলোর দিকে আঙুল তুললেন।

“জাদুটা এখনও লাগানো আছে। বাজ থাকবে বাইরে। আমরা ভেতরে।”

আমরা বয়ামটার দিকে তাকালাম। ভেতরে সাতটা বীজ, কয়েকটার ছোট ছোট পা কাচে সেঁটে, যেন কাচটা মাপছে, আর কাচে প্রতিটা বিদ্যুৎ-চমকের প্রতিবিম্ব কাঁপছিল। আটটার মধ্যে সাতটা। আমি, যে সবকিছু গুনি, সংখ্যাটা মনে রাখলাম: আট নয়, কিন্তু শূন্যও নয়, আর সেই রাতে আমার মনে হলো সাত দিয়ে শুরু করা যায়।

“অন্ধকারে,” ফ্লোরা আবার বললেন, টুকরোর দিকে তাকিয়ে।

আর টুকরো, আমার দিকে তাকিয়ে, হিক করল।



অধ্যায় ৪

হিক

ফ্লোরা আমাদের বুঝিয়ে দিলেন কীভাবে একটা লণ্ঠন-গাছ পুঁততে হয়, র. ওঁকে যেভাবে শিখিয়েছিলেন, আর আমি মার্কারটা চেপে ধরে লিখে নিলাম: চারটে ধাপ, আর সবচেয়ে জরুরি ছিল শেষটা, সময়সীমার।

কীভাবে লণ্ঠন-গাছ পুঁততে হয়

১. 

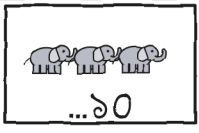
ঝড়ের জলে ভেজা মাটি।
(কলের জলের মাটি চলে না।)

২. 

মাটির ওপর বয়ামটা খোলা।
(আগে খুললে ওরা পালিয়ে যায়।)

৩. 

সব অন্ধকারে: ওরা নিজেরাই মাটিতে ঢুকে পড়ে।
(নিজে মাটিতে পুঁতলে ওরা গজায় না।)

৪. 

ঝড় চলে যাওয়ার আগে:
দশ হাতির বেশি হলে,
পরের ঝড় পর্যন্ত আর পোঁতে না।

ওদের জাগাতে শূন্য হাতি। পুঁততে দশ পর্যন্ত। এগারো হলে ঘুমিয়ে পড়ে। -হু.

তাহলে দুটো সময়সীমা: বীজদের জন্য দশ হাতি; আমাদের জন্য শেষ মেঘের ডাকের আধ ঘণ্টা পর।

আমি যখন লিখছিলাম, ফ্লোরা খাতায় আলো ধরে রাখলেন। ধাপগুলো উনি মুখস্থ বললেন। আমি র.-এর ব্যাপারে আর কিছু জিজ্ঞেস করলাম না।

দুই নম্বর আর তিন নম্বর ধাপের মাঝে আমার দুটো হিক উঠল। টুকরোর দুটো আগুনের হলকা, আর রান্নাঘর দুবার ফ্ল্যাশের মতো জ্বলে উঠল। কেউ কিছু বলল না; এতক্ষণে টুকরো আর আমি ছিলাম বাড়ির আলো। গুড়গুড়, টেবিলের নিচে, এমনভাবে শুনছিল যেন ধাপগুলো ওর জন্য।



ফ্লোরা গ্রিনহাউসের কাচের দরজা খুললেন আর প্রথমে ঢুকলেন। টুকরো আমার বুটের গায়ে সেঁটে ছিল। অন্তত আমি তা-ই ভেবেছিলাম।

গ্রিনহাউসটা রান্নাঘরের গায়ে লাগানো। লম্বা আর সরু, দেয়াল জুড়ে টবের তাক, আর মাঝখানে কেয়ারি: মাটিতে ভরা একটা লম্বা টেবিল, তার নিচেও আরও টব। দিনে নিশ্চয়ই সবুজ আর শান্ত একটা জায়গা। রাতে, ঝড়ের মধ্যে, প্রতিটা বিদ্যুৎ-চমকে পুরো ছাদটা সাদা হয়ে যাচ্ছিল।

ছাদে একটা জানালা আছে, যেটা কখনও খোলে না। ফ্লোরা ওটার ঘূর্ণি হাতল ঘোরালেন: জানালা বন্ধই থাকল, কিন্তু আঁকা ফোঁটাগুলো ওপরে ওঠা বন্ধ করে নিচে নামতে লাগল। তখন সত্যিকারের বৃষ্টি কাচ ভেদ করে এসে কেয়ারির মাটিতে পড়ল।

“সবটা কেয়ারিতে। একটা ফোঁটাও মেঝেতে নয়,” ফ্লোরা আদেশ দিলেন, যেন বৃষ্টিটা ওঁর।

একটু পরেই সদ্য জল-দেওয়া মাটির গন্ধ উঠল।

এই কাচ শুধু গল্পেই আছে। সত্যিকারের ঝড়ে গ্রিনহাউসে নয়। শেষ পাতাটা দেখো। -হু.

"ঝড়ের ভেজা মাটি," ফ্লোরা বললেন। "এবার সব অন্ধকারে। আর তাড়াতাড়ি।"



হুলিতা বয়াম দু হাতে ধরে দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল। হাতলের জায়গায় বয়ামকে নিয়েছিল, আর ঠিক তেমন করেই চেপে ধরেছিল।

তখন টব ঠোকাঠুকির আওয়াজ শোনা গেল, আর কেয়ারির নিচে, একেবারে পেছনে, দেখা গেল দুটো হলুদ চোখ, কাঁপতে থাকা দুটো ডানা, আর প্রতি তিন সেকেন্ডে একটা ছোট্ট শিখা। হিক। টুকরো ইতিমধ্যে ভেতরে ঢুকে পড়েছিল: দরজা খোলার সময় ও ফ্লোরার পায়ের ফাঁক দিয়ে গলে গিয়েছিল।

ফ্লোরা সাবধানে ওকে টানলেন। টুকরো চার পা দিয়ে টবগুলো আঁকড়ে ধরল।

দুটো টব আঁকড়ে ধরা একটা ড্রাগনের ছানা হঠাৎ ঠিক দুটো টবের সমান ভারী হয়ে যায়, আর ফ্লোরা, যিনি আগাছা উপড়ে ফেলেন তাদের অনুমতি না নিয়েই, ওকে ছেড়ে দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে ওর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ভেরা সাবধান করেছিলেন। আমি শুনেছি। তুমি তখন বুক ফোলাচ্ছিলে। -হু.

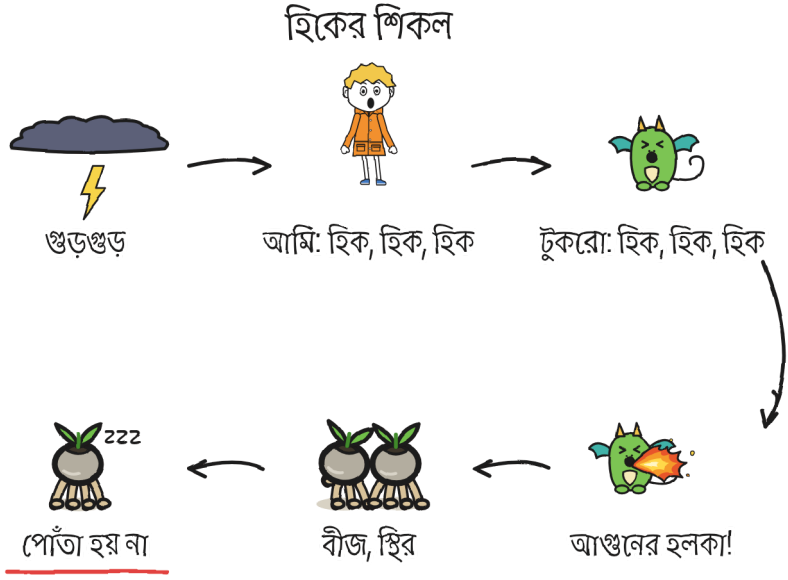
আর রান্নাঘরে আমি যতবার হিক করতাম, গ্রিনহাউসে ততবার টুকরো জ্বলে উঠত: দরজার ওপারে টবগুলো নিচ থেকে আলোকিত হচ্ছিল। হিক: ঝলক। হিক: ঝলক। ফ্রিজের আলোর মতো, শুধু দরজাটা ছিলাম আমি, আর নিজেকে বন্ধ করতে জানতাম না।

রান্নাঘরে হিক সাহায্য করছিল: হলকা, স্থির বীজ, ধরা-পড়া বীজ। এখানে ওটা পুঁততে বাধা দিচ্ছিল। প্রতি তিন সেকেন্ডে একটা হলকা, তাই অন্ধকার কখনও যথেষ্ট সময় থাকছিল না। মেঘের ডাক আর টুকরোর মাঝখানে ছিলাম আমি, একটা ছাঁকনি নিয়ে।

বোঝার জন্য আমি এঁকে ফেললাম।

আমরা হেঁচকির সব টোটকা চেষ্টা করলাম, সহকারী টুকরো: ও টোটকাটাও নকল করত, আর বখশিশ হিসেবে হিকও।

নিশ্বাস আটকে রাখা: আমি বেগুনি হলাম, আর ও আরও সবুজ। উল্টো করে জল খাওয়া: শেষে আমার নাকে জল ঢুকল। চমকে দেওয়ার দায়িত্ব নিল তোনিও, যে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল "ভুঁউ!": চমকটা আমি পেলাম, হিকও তুললাম, আর টুকরোর হলকা ওর হেলমেটের বাজ-চিহ্নটা ঝলসে দিল। শেষটা ছিল এক চামচ চিনি, ফ্লোরার বুদ্ধি: টুকরোরটা ওর মুখে পৌঁছনোর আগেই ক্যারামেল হয়ে গেল, আর গ্রিনহাউসে অনেকক্ষণ মেলার গন্ধ রইল।



শিকলটা ভাঙতে হবে। সবচেয়ে সহজ কড়াটা হলে তুমি। ভালোবেসেই বলছি। -হু.



দম আটকে রাখা



উল্টো করে জল খাওয়া



চমকে দেওয়া



চিনি



“চার হাতি। পাঁচ।”

মেঘ ডাকল। আমি দাঁতে দাঁত চাপলাম। হিক।

“ওই বাজ আরও দূরে পড়েছে,” হুলিতা বলল।

সাতটা বীজ বয়ামের ভেতর পাক খাচ্ছিল। ওরা বেরোনোর পথ খুঁজে পাচ্ছিল না, আর আমিও চুপ করার উপায় খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

“দশ পর্যন্ত,” আমি বললাম। “এখনও পারি।”

পরের বিদ্যুৎ-চমকে তোনিও তাড়াতাড়ি গুনতে শুরু করল।

“এভাবে হয় না,” হুলিতা বলল।

ও মুখ বন্ধ করল। ফ্লোরা নেভানো টর্চ হাতে অপেক্ষা করছিলেন। আমাকে তাড়াতাড়ি করতে বললেন না। সেটা প্রায় আরও খারাপ ছিল।

“টুকরো তোমার ভয় নকল করছে,” হুলিতা বলল।

“তাহলে অন্য কিছু নকল করুক,” আমি বললাম।

হিক। হলকা।

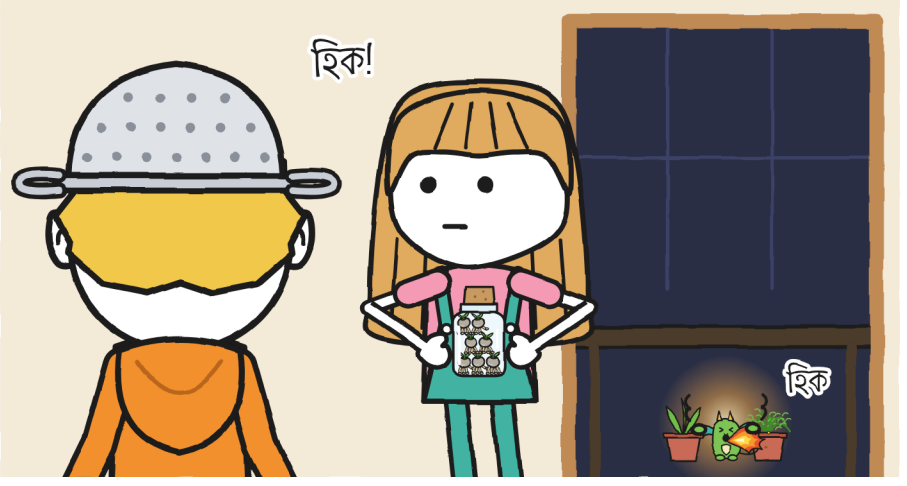
“ওকে রান্নাঘরে বের করে আনলে?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

“ও আঁকড়ে ধরে। তুমি তো দেখেছ।”

আমি গ্রিনহাউসের দরজার দিকে তাকালাম। আগের চেয়ে ওটা অনেক দূরে মনে হলো।

হুলিতা গলা নামাল।

“আগে ওর কাছে থাকো।”



আমার একটা প্ল্যান ছিল। সমস্যা হলো, এই কাজে ওটা চলে না।

মেঘের ডাকে আমার ভয় লাগে সেটা যাতে বোঝা না যায়, তার জন্য আমার প্ল্যান:

১. বলা যে ওগুলো আমার ভালো লাগে।
২. হিক না করা।
৩. ???

২ নম্বর পয়েন্টটা আমি সেই রাতে কেটে দিলাম হিকের পর হিক করে, যতক্ষণ না আর পড়া গেল না। ১ নম্বরটা তখনও ছিল, কিন্তু আর কেউ সেটা বিশ্বাস করছিল না, আমিও না।

আর ৩ নম্বর? -হু.

আমি চেষ্টা করলাম। সত্যিই করলাম।

দোরগোড়ার কাছে গেলাম। হুলিতা বয়াম নিয়ে সরে দাঁড়াল, আমার জন্য জায়গা করে দিতে। কেউ আমাকে ঠেলল না।

গ্রিনহাউসে এক পা রাখলাম, খুব দৃঢ়ভাবে, মাথায় ছাঁকনি পরে আর এক হাত দরজার চৌকাঠে। পা ঠিকমতো ঢুকল। ঢুকল ঠান্ডা সকালে পুকুরে পা যেভাবে ঢোকে: পা, হ্যাঁ; বাকিটা, দেখা যাক।

একটা বিদ্যুৎ-চমক পুরো ছাদটা সাদা করে দিল। আমি না চাইতেই গুনে ফেললাম: পাঁচ হাতি।

গুরুরুম!

জাদু-কাচ শব্দ আটকায় না। পুরো ছাদটা ঢাকের মতো বেজে উঠল। হিক! কেয়ারির নিচে: হিক!, আর একটা আগুনের হলকা।

পরের যা আমার মনে আছে, আমি আবার রান্নাঘরে, ফ্রিজের গায়ে সেঁটে, ছাঁকনি ভুরু পর্যন্ত নামানো। হাঁটার কথা মনে নেই। আমার হাতের মতো আমার পায়েরও নিজস্ব অভ্যেস আছে।

আমি ফ্রিজের গায়ে হেলান দিয়ে রইলাম, হাত ঠান্ডা, হৃৎপিণ্ড কানে। আমার মাথা থেকে দুই আঙুল দূরে ছিল খালপাড়ের পথের ছবি: এক সারি ছোট ছোট আলো, যেগুলো আপাতত আমি হিক দিয়ে নেভাচ্ছিলাম।



দরজা থেকে আমি ওপরে তাকালাম, কাচের ছাদের দিকে। আর বিদ্যুৎ-চমকের ফাঁকে ফাঁকে ওদের দেখলাম: ভেরার ড্রাগনরা, ঝড়ের ভেতরে উড়ছে।

ওরা চারটে। তিনটে বিশাল, নীল, কমলা আর বেগুনি, বাজের মাঝখান দিয়ে চলেছে যেন বাজগুলো রানওয়ের আলো; আর ওদের মাঝখানে চতুর্থটা, লাল, ছোট। ওরা উড়ছিল ছাদের অনেক ওপরে, ঝড়ের ভেতরে, যেখানে সবচেয়ে বেশি মেঘ ডাকে, আর ওদের কোনো তাড়া দেখা যাচ্ছিল না। একটা বিদ্যুৎ-চমক ওদের পুরো এঁকে দিত, সাদা, প্রতিটা আঁশ সমেত; তারপর নিভে যেত, আর ওরা যে এখনও ওখানে আছে, তা বোঝা যেত ছাদের বৃষ্টি ছায়ায় ভাগ হয়ে যাওয়া দেখে।

সেজন্যই ভেরা আমাদের সঙ্গে আসেননি: ঝড়ে ওরা উড়তে বেরোয়, আর উনি বাড়িতে থাকেন, ওরা ফিরে না আসা পর্যন্ত ওদের জন্য চোখ রেখে। আমি ড্রাগনদের দিকে তাকালাম, তারপর কেয়ারির দিকে। টুকরো একদিন ওদের সঙ্গে উড়বে। সেই রাতে ও টবগুলোর মধ্যে বলের মতো গুটিয়ে ছিল, আমাকে নকল করে।

ওদের হিক উঠছিল না।

“চলো, শিকারি,” তোনিও বলল।

আমি ঠাট্টার অপেক্ষায় রইলাম। এল না। তোনিও আমার কাঁধে একটা হাত রাখল।



আমি ছাঁকনিটা খুলে ফ্লোরাকে দিলাম।

ফ্লোরা ওটা দুই হাতলে ধরলেন, যেন সত্যিকারের হেলমেট। আমি চ্যাপ্টা হয়ে যাওয়া চুলে হাত বুলিয়ে নিলাম। মাথাটা ঠিক ততটাই ভারী লাগছিল।

আর আমি ঢুকলাম।

ভেতরে বৃষ্টির শব্দ ছিল হাজারটা আঙুলের একসঙ্গে টোকা দেওয়ার মতো। আমি হামাগুড়ি দিয়ে কেয়ারির নিচে ঢুকলাম। টুকরো ওখানেই ছিল, গুটিয়ে, আমার মতোই কাঁপতে কাঁপতে।

ভেজা মাটির গন্ধ। আমি ওর পাশে নিচু হয়ে হাঁটু জড়িয়ে ধরলাম। আমি কাঁপছিলাম পেট থেকে; ও, ডানা থেকে। দুজন মিলে আমরা টবগুলো কাঁপাচ্ছিলাম।

আমি গোনার চেষ্টা করলাম। “এক হাতি, হিক, দুই হা..., হিক।” হিকগুলো হাতিদের মাঝখানে ঢুকে পড়ছিল। হিসেব হারিয়ে ফেললাম।

বেরিয়ে যাওয়ার কথা ভাবলাম। আমার পা দুটো ইতিমধ্যে শুরু করে দিয়েছিল।

টুকরো চার পা দিয়ে টবগুলো আঁকড়ে ধরল।

আমি থেকে গেলাম।

গুরুরুম! আমার হিক উঠল। টুকরোর হিক উঠল। আগুনের হলকা আমাদের দুজনকেই আলোয় ভরে দিল।

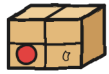
ওর মুখ ছিল আমার মুখেরই মতো। আঁশ সমেত।

আমরা ছিলাম কেয়ারির নিচে দুজন ঝড়-শিকারি।

তখন, দরজা থেকে, হুলিতা নিচু গলায় বলল, হাসি ছাড়া:



"আমাকে গুনে নাও।"



অধ্যায় ৫

আমাকে গুনে নাও

আর আমরা গুনলাম। ও দরজা থেকে, আর আমি কেয়ারির নিচে, উবু হয়ে, রেনকোটের গায়ে টুকরোকে কাঁপতে কাঁপতে নিয়ে।

বিদ্যুৎ-চমক।

“এক হাতি। দুই হাতি। তিন। চার। পাঁচ। ছয়।”

গুরুরুম।

“ছয়: প্রায় দুই কিলোমিটার,” হুলিতা বলল। “ওই বাজ আরও দূরে পড়েছে। আমরা এখনও নিরাপদ আশ্রয়ে।”

এবার আমি জানতাম মেঘের ডাকটা ছয়ে এসেছে। না গুনলে ওটা শুধু আরেকটা মেঘের ডাক হতো। গোনা আমাকে অপেক্ষার সময় করার মতো একটা কাজ দিয়েছিল।

টুকরো আমার রেনকোটের গায়ে কাঁপতেই থাকল।

আমি ছাঁকনি চেষ্টা করে ফেলেছি। আর জল। আর গ্রিনহাউস থেকে বেরোনো। আর আবার ঢোকা।

“মেঘের ডাকে আমার ভয় লাগে।”



কথাটা আমি টবগুলোর দিকে মুখ করে বললাম। হুলিতা তবু শুনল।

“আমি জানি। তুমি আজ সকালে এঁকেছিলে, যখন বলেছিলে তুমি ঝড়-শিকারি। আমি তোমার অপেক্ষায় ছিলাম।”

হুলিতা আমাকে আগেই বলেছিল যে টুকরো আমার ভয় নকল করছে। আমি অন্য কিছু ঠিক করতে ব্যস্ত ছিলাম: হেঁচকি, টব, দরজা।

এবার আমি “কিন্তু” বললাম না।

ওকে আমি জোরে ধন্যবাদ বলিনি। এখানে রেখে যাচ্ছি।

পড়েছি। কিছু না। -হু.

“আমার বেড়ালে ভয় লাগে,” তোনিও বলল।

গুড়গুড় ওর হাঁটুতে ঘুমোচ্ছিল। তোনিও হাত নাড়াল না।

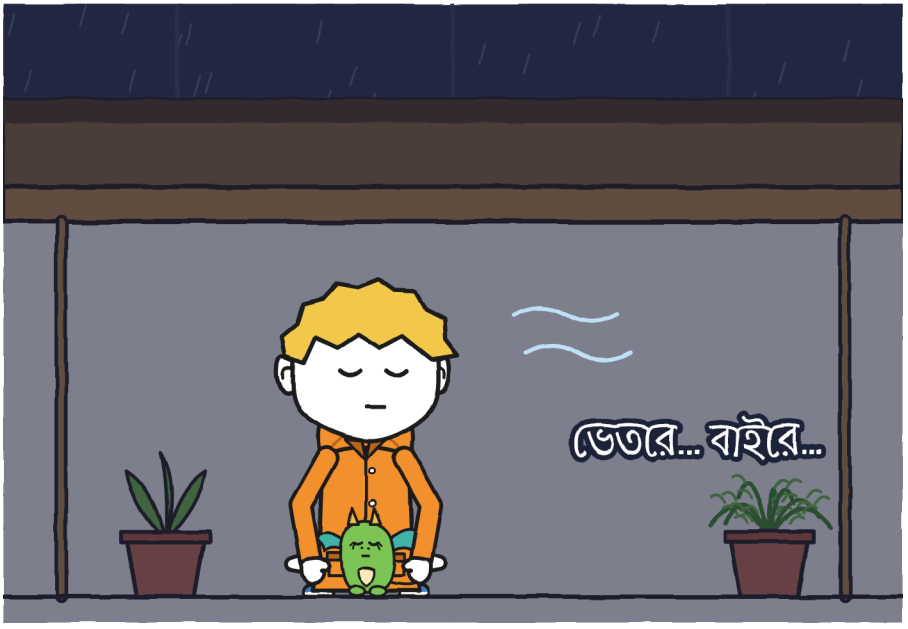
“আর আমার, যা আসে না তার অপেক্ষায়,” ফ্লোরা বললেন। “সেজন্যই আমি বয়াম সঙ্গে সঙ্গে খুলে ফেলতাম।”

আর আমার ভয় সাঁকোয়। সেটা তোমরা জানতেই। -হু.

কেউ হাসল না।

বাইরে আগের মতোই বৃষ্টি পড়ছিল। টুকরো আগের মতোই আমার রেনকোটের গায়ে। কেয়ারির নিচে আমি আর একা ছিলাম না।

আমি ধীরে নিশ্বাস নিলাম, সাঁকোতে যেমন নিয়েছিলাম। ভেতরে। বাইরে। টুকরোও আমার সঙ্গে নিশ্বাস নিল। ও কাঁপা থামালে আমার হাতও একটু আলগা হলো।



বিদ্যুৎ-চমক। আমরা একসঙ্গে নয় পর্যন্ত গুনলাম। গুরুরুম। তোনিও, চেয়ার থেকে, নিচু গলায় “একদুইতিন” বলল আর তিনেই থেমে গেল, যেখানে ও সবসময় থামে। গুড়গুড় জাগলই না।

আর আমার হিক উঠল না। না ওই ডাকে, না পরেরটায়।

আমি হিকের অপেক্ষা করলাম, আর এল না। টুকরো মাথা কাত করল। সারা রাতে প্রথমবার, গ্রিনহাউস যতক্ষণ দরকার ততক্ষণ অন্ধকার রইল।

"এবার!" ফ্লোরা ফিসফিস করলেন।

হুলিতা পা টিপে টিপে ঢুকল, অন্ধকারে। কেয়ারির নিচে উবু হয়ে থেকে আমি ওর চটির শব্দ আমার সামনে দিয়ে যেতে শুনলাম, ধীরে, একটার সামনে আরেকটা, যেন গ্রিনহাউসের মেঝে একটা সাঁকো। ও ভেজা মাটির ওপর বয়ামটা রাখল আর ছিপি খুলল। ছিপিটা একটা ছোট্ট ফট করল, মাফ চাওয়া গোছের; রান্নাঘরের সেই ফটাস!-এর সঙ্গে কোনো মিল নেই। তারপর ও দরজায় ফিরে গেল, শব্দ না করে, না ছুটে, পা স্থির রেখে।

এবার বয়ামটা আমি ঠিক সময়ে খুলেছি। রেকর্ডে থাকুক। -হু.

টুক, টুক, টুক। অন্ধকারে বয়াম থেকে কিছু বেরোচ্ছিল।

কিছু দেখা যাচ্ছিল না: শোনা যাচ্ছিল। শিকড়-পায়ের সাতটা ছোট্ট আওয়াজ, কাচ বেয়ে নামছে আর ভেজা মাটি মাড়াচ্ছে, প্রতিটার জন্য একটা টুক, বৃষ্টির চেয়ে একটু ধীরে। আমার মনে হয় আমার জীবনে শোনা এটাই সবচেয়ে ছোট আওয়াজ, আর আমি আর কখনও কিছু এত মন দিয়ে শুনিনি, এমনকি দুই শনিবার আগে টুকরোর ডিমের খোসা ভাঙার শব্দও না।

বিদ্যুৎ-চমক, অনেক দূরে। আমরা গলায় আওয়াজ না করে, শুধু ঠোঁট নেড়ে গুনলাম, হুলিতা দরজায় আর আমি কেয়ারির নিচে: এক হাতি, দুই, তিন... সাত হাতি, আট, নয়, দশ... গুরুরুম।

দশ। আর এক হাতি হলে সাতটাই পরের ঝড় পর্যন্ত মাটির ওপর ঘুমিয়ে পড়ত। দশই ছিল শেষ গ্রহণযোগ্য সংখ্যা।

পরের বিদ্যুৎ-চমকে আমরা দেখলাম:

বয়ামটা খালি, কেয়ারির এক প্রান্তে শোয়ানো। মাটিতে সারি সারি সাতটা ছোট্ট গর্ত, বাঁশির ফুটোর মতো, আর শেষটায় তখনও একটা শিকড়-পা উঁকি দিচ্ছিল, ভেতরে ঢুকে যাচ্ছিল: শেষটা।



তারপর আবার অন্ধকার, আর পরের বিদ্যুৎ-চমকে পা-টা আর ছিল না।



এরপর কিছুক্ষণ কিছুই না। শুধু আমরা, অন্ধকারে, এক কেয়ারি মাটির দিকে তাকিয়ে।

ফ্লোরার হাত দুটো মুখের সামনে জোড়া। তোনিও নড়ছিল না, বেড়ালের জন্য। হুলিতা, একবারের জন্য, নড়ছিল না। টুকরো আর আমি একসঙ্গে নিশ্বাস নিচ্ছিলাম।

আর তখন প্রথমটা জ্বলে উঠল।

কেয়ারির মাঝখানে ছোট্ট একটা আলো, সবুজ আর সোনালি, মোমবাতির শিখার মতো ছোট, মাটি থেকে উঠছিল। বাড়ল। সরু একটা ডাঁটা বেয়ে উঠল, যেভাবে স্ট্র দিয়ে রস ওঠে, আর ওপরে ফুটল গোল, বন্ধ একটা ফুল, পাতলা কাগজের মতো, ভেতরে আলো নিয়ে। তারপর জ্বলল দ্বিতীয়টা। তারপর আর আমি ক্রমানুসারে

গুনতে পারলাম না, কারণ বাকিগুলো প্রায় একসঙ্গে জ্বলে উঠল, যেভাবে রাত হলে রাস্তার বাতিগুলো জ্বলে।



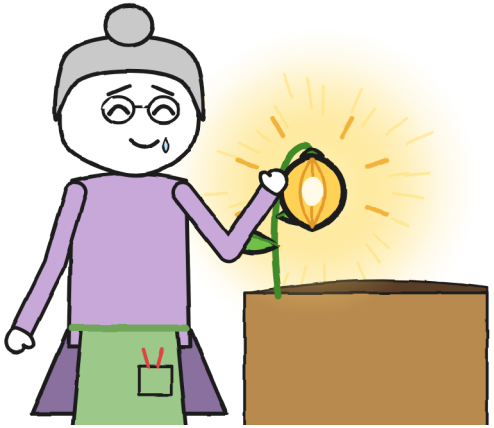
সাতটা লণ্ঠন-গাছ। প্রতিটার ভেতরে এক টুকরো বিদ্যুৎ-চমক।

ওটা বিদ্যুৎ-চমকের আলো ছিল না। বিদ্যুৎ-চমক এক নিমেষের জন্য পুরো গ্রিনহাউস সাদা করে দেয় আর আগের চেয়েও খারাপ অবস্থায় রেখে যায়। এটা ছিল হলুদ, একটু সবুজ মেশানো, আর এটা থেকে গেল: একটা স্থির বিদ্যুৎ-চমক, এমন একটা, যে অপেক্ষা করতে শিখেছে। ঠিক যতটুকু আলো দরকার ততটুকুই দিচ্ছিল: মাটি, ডাঁটা, মুখগুলো। ফ্লোরা, দুই হাত মাথায়। হুলিতা, হাঁ করে, বলার মতো ভেতরে কিছুই নেই। তোনিও, গুড়গুড়কে কোলে নিয়ে, বুঝতে না পেরে বেড়ালটা ওখানে কীভাবে এল। আর টুকরো আর আমি, সদ্য কেয়ারির নিচ থেকে বেরোনো। টুকরো হাঁ করে তাকিয়ে ছিল, আমার মতোই। ও আর আমার ভয় নকল করছিল না। ও এটা নকল করছিল।

দূরে, অনেক দূরে, আবার মেঘ ডাকল। হুলিতা অভ্যাসবশে নিচু গলায় গুনল, আর পথেই সংখ্যাটা হারিয়ে ফেলল।

ফ্লোরা অনেকক্ষণ কিছু বললেন না। তারপর একটা ফুল আঙুলের ডগায় ছুঁলেন, ধীরে, যেভাবে কেউ ছোঁয় এমন কিছু, যা অনেকদিন ধরে তার অপেক্ষায় ছিল।

“পথটা ঠিক এমনই দেখাত,” উনি বললেন।



কথাটা উনি বললেন ফুলের দিকে তাকিয়ে। ফ্রিজের ছবিতে এমনই একটা আলো ছিল, আর আরেকটা, আর আরেকটা, সাঁকো পর্যন্ত।

ফ্লোরার চশমা ঝাপসা হয়ে গেল। আমি লিখব না যে উনি কাঁদলেন। আমি আঁকি, আর সেটা এক জিনিস নয়: ফ্লোরা তাঁদের দলের নন, যাঁরা কাঁদেন; উনি তাঁদের দলের, যাঁরা জল দেন।

আমিও একটা ছুঁলাম। টুকরোও, একটা থাবা দিয়ে, খুব সাবধানে। ওটা হালকা গরম ছিল, টুকরোর বাসার সূর্যপাথরের মতো, যা দিনের তাপ ধরে রাখে। এটা অন্য একটা জিনিস ধরে রেখেছিল, আর সমান ভালোভাবেই। ফ্লোরার ফার্নগুলো অবশ্য আস্তই ছিল।



ফ্লোরা হাতল ঘোরালেন। আঁকা ফোঁটাগুলো আবার উঠতে লাগল আর কেয়ারিতে বৃষ্টি পড়া থামল। তারপর ওখানেই, লণ্ঠন-গাছগুলোর মাঝখানে, সই করার জন্য একটা কলম বের করলেন।

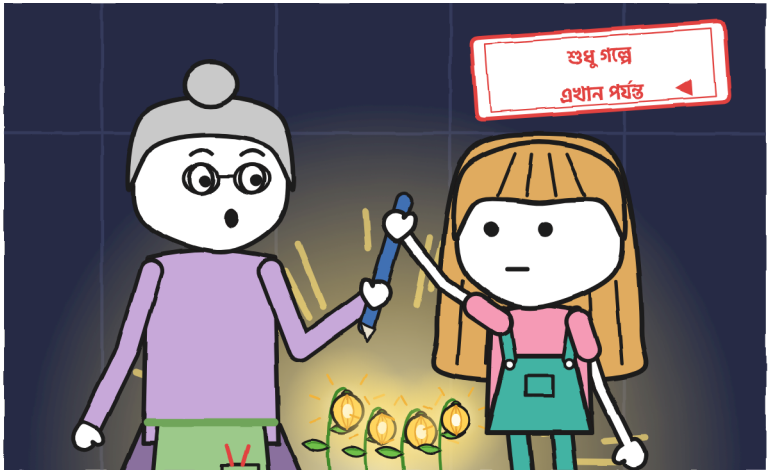
কলমটা নীল ছিল। ওটা মোছে কি না দেখার সময়ই পেলাম না, কারণ হুলিতার হাত ততক্ষণে ওটার ওপর।

“এখনও না,” হুলিতা বলল, আর ওঁর হাত থামিয়ে দিল। “একটা বাকি। আট নম্বর। ও আমার দোষে চলে গেছে: আমি সময় হওয়ার আগে বয়াম খুলেছিলাম।”

হুলিতা সারাদিন ওই সইয়ের অপেক্ষায় ছিল। এইমাত্র দুই আঙুলে সেটা থামিয়ে দিল।

ফ্লোরা কলম হাওয়ায় ধরে রইলেন। তারপর ওটা রেখে দিলেন।

“ঠিক আছে,” উনি বললেন।



আমরা একজন একজন করে রান্নাঘরে ফিরলাম, সাতটা লণ্ঠন-গাছ কাচের ওপারে জ্বলতে জ্বলতে। রান্নাঘরে এসে ফ্লোরা আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন:

“উঠোন এখনও বন্ধ। আমরা এখনই বেরোচ্ছি না।”

কেউ তর্ক করল না।

হুলিতা বাক্স থেকে লেবেলটা খুলে নিল, ধীরে, যাতে না ছেঁড়ে, আর ডাঙ্গারির পকেটে রেখে দিল, যেভাবে কেউ চাবি রাখে।

পৌঁছে দিলে পুরোটাই পৌঁছে দিতে হয়। -হু.

আমরা রান্নাঘরে অপেক্ষা করলাম, যতক্ষণ না হুলিতার গোনার মতো বিদ্যুৎ-চমক ফুরোল।

বারো হাতি। ষোলো। একুশ, আর এমন একটা মেঘের ডাক, যেটা আর মেঘের ডাক ছিল না, দুই তলা ওপরে টেনে সরানো আসবাবের শব্দ মাত্র। তারপর আকাশ মেঘের আড়ালে শেষবারের মতো জ্বলে উঠল, আর হুলিতা গুনতে গুনতে হাতি ফুরিয়ে ফেলল, আর কিছু এল না। জানালায় বৃষ্টি থেমে গেল। ঝড় চলে গিয়েছিল। তবু ফ্লোরা

আমাদের আরও আধ ঘণ্টা ভেতরে রাখলেন, শেষ মেঘের ডাক থেকে গোনা। ওটা হুলিতারই নিয়ম, আর এবার সেটা মানার পালা পড়ল ওরই, দাঁতে দাঁত চেপে।

ফ্লোরা পেছনের দরজা খুললেন। উঠোন ভেজা আর শান্ত, টালিগুলো চকচক করছে, আর মেঘের ফাঁকে তারা, অল্প কয়েকটা, যেগুলো বেরিয়ে আসে দেখতে কী হয়েছে। হুলিতা দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রইল, আমি ওর পাশে।

আট নম্বরটা তখনও বাইরে। ফ্লোরার বাড়ি থেকে সাঁকো দেখা যায় না: খালপাড়ের পথের পাঁচিল ঢেকে রাখে। যদি ও সময়মতো মাটি না পেয়ে থাকে, তাহলে এতক্ষণে আরেকটা পাথর। আমি ভাবলাম বৃষ্টি খালের দিকে নেমে যাচ্ছে, আর জলের দিকে তাকানো বন্ধ করলাম।

আর সেই পুরোনো সময়সীমা বাকি ছিল: ফ্লোরার সই ছাড়া, ভোরে ২ নম্বর উড়ে নিজের তাকে ফিরে যাবে। সূর্য ওঠা পর্যন্ত আমাদের সময় ছিল।

“চলো ওকে খুঁজতে যাই,” হুলিতা বলল।

হুলিতার হাত আবার দরজার হাতলে। এবার দরজা খোলা ছিল।



ফ্লোরা অনেকক্ষণ রাতের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর উঠোনের পাঁচিলে, ড্রাগনদের বাড়ির দেয়ালে, তিনটে টোকা দিলেন, যেমন ভেরা বলেছিলেন। ঠক, ঠক, ঠক। আঙুলের গাঁট দিয়ে, তাড়াহুড়ো না করে।

পাঁচিলের ওপরে, ওপারে, একটা লণ্ঠন জ্বলে উঠল।

“এবার,” উনি বললেন, “তোমরা একা যাচ্ছ না।”



অধ্যায় ৬

আট নম্বর বীজ

আমরা বেরোলাম দুজন বড়, একটা লণ্ঠন আর একটা সাইকেল নিয়ে। তার আগে ফ্লোরা আমার বাড়িতে আর হুলিতার বাড়িতে ফোন করলেন: “আজ রাতেই ওদের ফিরিয়ে দিচ্ছি, আর ওরা একা যাচ্ছে না।”

আমার জীবনের প্রথম বেরোনো, যেটা হলো তালিকা করে:

- ভেরা, তাঁর লণ্ঠন নিয়ে।
- ফ্লোরা, টর্চ নিয়ে।
- তোনিও, সাইকেল নিয়ে, ঠেলতে ঠেলতে, যাতে ডায়নামো আলো দেয়।
- হুলিতা, খালি বয়াম আর ডাঙ্গারির পকেটে লেবেল নিয়ে।
- আর আমি, রেনকোটের ভেতরে টুকরোকে নিয়ে, ওর মাথা বাইরে।

ঠোকা দেওয়ার এক মিনিট পরে ভেরা রাস্তা দিয়ে এলেন, ভেজা লাল চুল আর উঁচু করে ধরা লণ্ঠন নিয়ে। কে কী হারিয়েছে জিজ্ঞেস না করেই উনি আমাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

টুকরো আর আমি আর কাঁপছিলাম না।



আমরা উঠোনে খুঁজলাম, সরু পথে, খালের পাড়ে।

ফ্লোরা টর্চ দিয়ে টালিগুলো দেখলেন। তোনিও সাইকেল ঠেলে ঠেলে কার্ব ধরে ঘুরল। হুলিতা পথের পাথরগুলো ছুঁয়ে দেখল, কোনোটা গরম কি না। টুকরো আর আমি প্রতিটা ঝোপের নিচে দেখলাম। কিছু নেই।

ঘুমন্ত একটা বীজ, রাতে, আরেকটা পাথরই। আর একটা পথে পাথর অগুনতি: কথাটা আমি সেই রাতে আবিষ্কার করলাম, হুলিতার পাশে হাঁটু গেড়ে। সবগুলোকেই ঘুমন্ত বীজ মনে হচ্ছিল। কোনোটাই তা ছিল না।

তোনিও খুঁজল যেভাবে ডেলিভারি করে: পুরো পথ দশ মিনিটে, যাওয়া আর আসা, তারপর আবার।

লণ্ঠনের আলো ভেজা পাথরে ঝিলিক তুলছিল। তখন আমি ভাবলাম: নতুন গজানো লণ্ঠন-গাছের আলো ক্ষীণ হবে। আমরা ছোট্ট একটা আলো খুঁজছিলাম, অথচ আমাদের তিনটে আলো জ্বলছিল: ওরা সেটাকে গিলে ফেলছিল।

“সব নিভিয়ে দাও!” আমি বললাম।

কেউ কারণ জিজ্ঞেস করল না। তোনিও হঠাৎ ব্রেক কষল, আর সাইকেলের আলো নিভে গেল (বিজলি কখনও থামে না)। ভেরা লণ্ঠনের শিখা এত নামালেন যে প্রায় কিছুই রইল না। ফ্লোরা টর্চ নেভালেন। এক মুহূর্ত পুরো পথে কোনো আলো রইল না।

আর অন্ধকারে, পথের একেবারে শেষে, ছোট্ট একটা আলো দেখা গেল।

ওটা সাঁকোর গোড়ায়।

হুলিতা ওটার দিকে হাঁটতে শুরু করল। আমরা বাকিরা পেছনে পেছনে।

বৃষ্টি ওকে সরু পথ ধরে খালপাড়ের পথে টেনে এনেছিল, আর ও আটকে ছিল দুটো পাথরের মাঝের একটা ফাটলে, যেখানে সবসময় এক আঙুল মাটি থাকে আর এমন একটা ঘাস, যা কেউ লাগায়নি। সেখানে ও নিজেই নিজেকে পুঁতেছিল। দূর থেকে একটা ছোট্ট আলো। কাছ থেকে, সবকিছু আলোকিত করছিল।

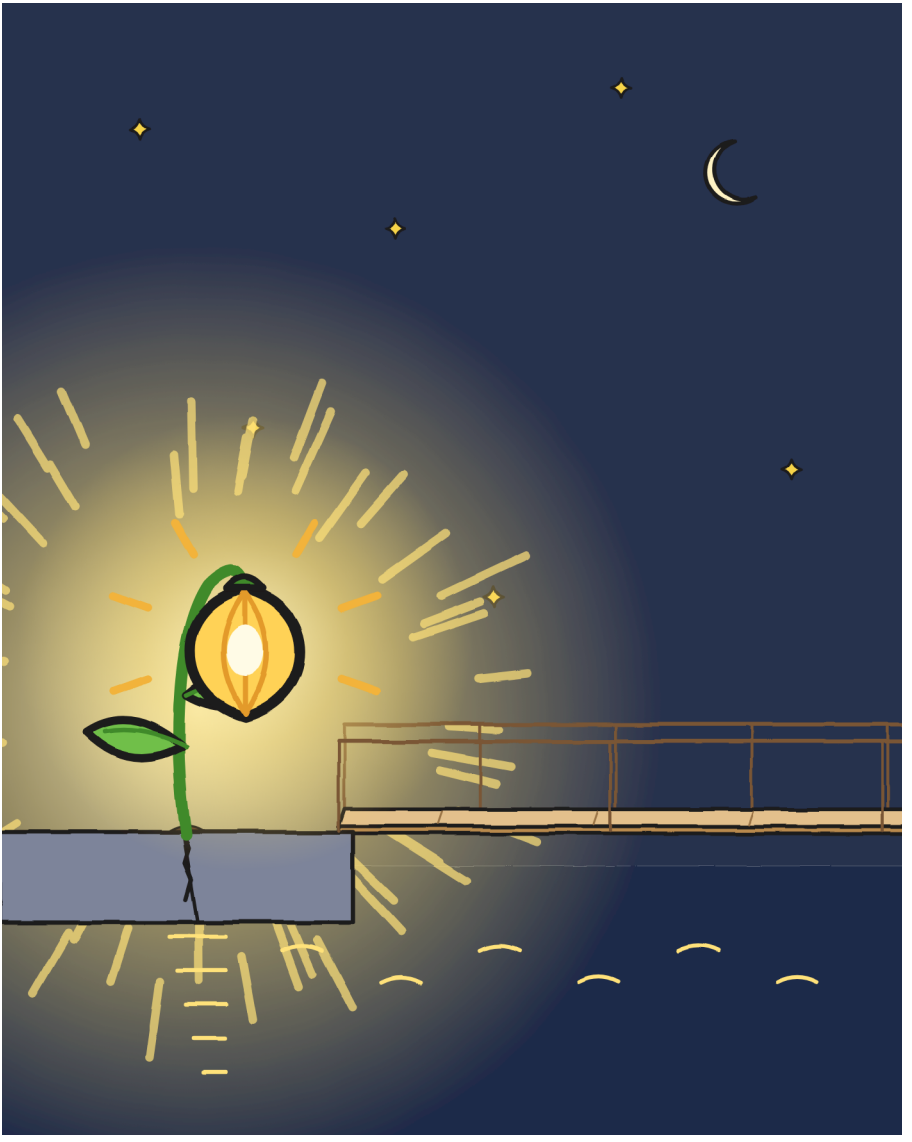


ডাঁটা বাঁকা, আর আলোটা গ্রিনহাউসের সাতটার মতোই। সাঁকোর শুরুটা আলোকিত করছিল, আর খানিকটা জল।

হুলিতা সাঁকোর দিকে তাকাল। আলোয় ওটা অন্যরকম দেখাচ্ছিল: ছোট, চওড়া, জলের চেয়ে কাঠের বেশি। এবার দেখা যাচ্ছিল ওটা কোথায় শেষ হয়েছে।

ও তক্তার ওপর একটা পা রাখল। শুধু একটা। তারপর সরিয়ে নিল। ওটা পদক্ষেপ ছিল না, ছিল পরীক্ষা, কিন্তু পা-টা এক মুহূর্ত শক্ত হয়ে দাঁড়াল, নিচে আট নম্বরের আলো নিয়ে, আর কেউ কিছু বলল না। আমি "এগোও" বললাম না: এবার ও পথটা দেখতে পাচ্ছিল।

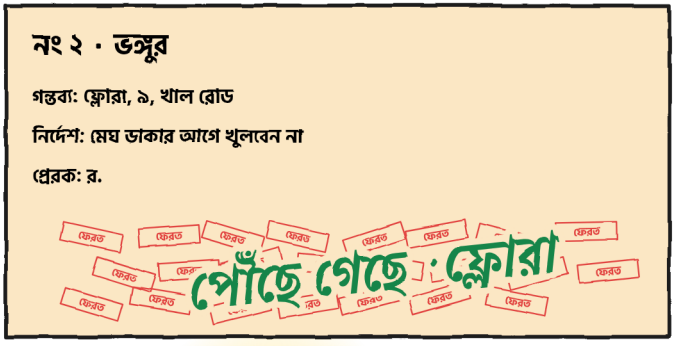
দূর থেকে আর ভয় লাগে না। কাছ থেকেও প্রায় না। -হু.

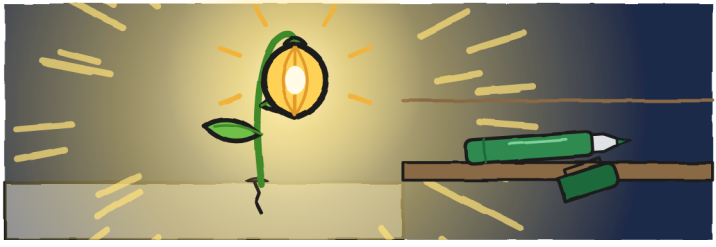


“ও এখানেই থাকবে,” ফ্লোরা বললেন। “জায়গা বেছে নিয়েছে।”

হুলিতা লেবেলটা আর তার সবুজ মার্কারটা বের করল। ফ্লোরা সাঁকোর কিনারায় সেটা রেখে আট নম্বরের আলোয় সই করলেন।

তেইশটা "ফেরত" সিলমোহরের ওপর সবুজ কালিতে লেখা হয়ে গেল: পৌঁছে গেছে · ফ্লোরা।





বিদায় নেওয়ার সময়, ওঁর দরজায়, ফ্লোরা আমাকে ওঁর ছাঁকনিটা দিলেন।

"এটা তোমার থাক। পরের ঝড়ের জন্য।"

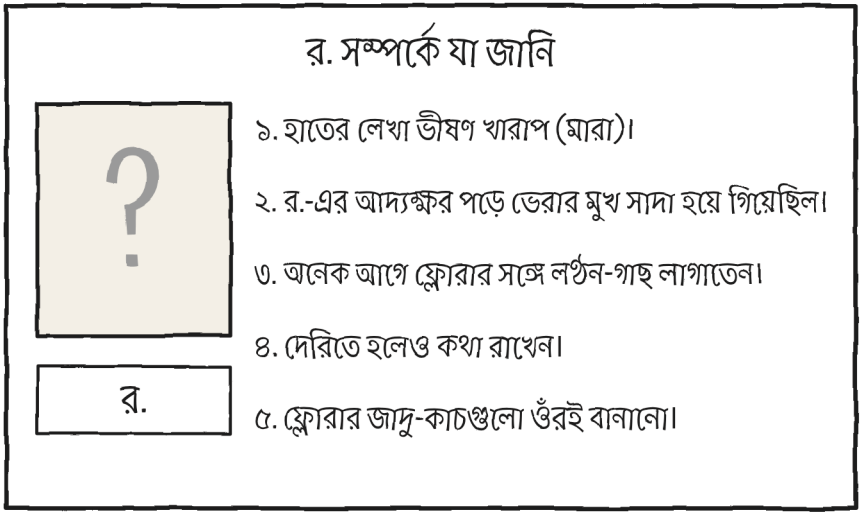
তারপর যোগ করলেন:

"আর মারাকে বোলো, এতদিনে হলো!"

উনি ওটা দুই হাতলে ধরে আমাকে দিলেন, যেন সত্যিকারের হেলমেট। উনি বললেন না "আরেকটা ঝড় হলে": বললেন "পরের", যেভাবে বলা হয় পরের শনিবার।

এখন ওটা ঝুলছে আমার ঘরের জানালার হাতলে, বাক্সগুলোর ওপরে, যেগুলো এখনও বন্ধ। ওই ঘরের এটাই প্রথম জিনিস, যেটা কোনো বাক্সে আসেনি।

খবরটা নিয়ে আমি কিছু জিজ্ঞেস করতে পারিনি: আমার সময় পাওয়ার আগেই ফ্লোরা দরজা বন্ধ করে দিলেন। র.-এর কার্ডটা এভাবে থাকল:



৬. কেউ ওঁর নাম বলে না। সেটাও একটা সূত্র। -হু.

ভেরা টুকরোকে ওর বাসায় রেখে দিলেন, পৌঁছনোর আগেই ঘুমিয়ে, আমার ডোরাকাটা সোয়েটারের ওপর, যেটা দুই শনিবার ধরে ওখানেই আছে আর এখন আমার চেয়ে ওর গন্ধই বেশি। “ওর প্রথম ঝড়,” উনি বললেন, আর থুতনি পর্যন্ত ঢেকে দিলেন। ও হাঁ করে ঘুমোচ্ছিল, আমার মতোই, মায়ের কথায়। ঝড়টা ওর মনে থাকবে না। সেজন্যই তো ওর জন্য এই খাতা আছে।

তারপর উনি আমাদের দোকানে পৌঁছে দিলেন ওঁর ভ্যানে, তোনিওর সাইকেল পেছনে শোয়ানো, হাইওয়ের সেতু দিয়ে: বড় সেতু তখন তোলা। হুলিতা খালের দিকের

জানালার ধারে বসল আর পুরো সেতু জুড়ে জলের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে রইল: ও কিছু একটা খুঁজছিল। আর দেখাও গেল। একেবারে শেষে, সাঁকোর গোড়ায়, খুদে একটা আলো। একটা। এমন এক খালে, যেখানে বছরের পর বছর কোনো আলো ছিল না।

দোকান অন্ধকার। শুধু আলো নেই বলে নয়: পুরোপুরি অন্ধকার, সাইনবোর্ড পর্যন্ত; যেটুকু দেখা যাচ্ছিল তা রাস্তার বাতির আলোয়। ভেরা আমাদের দরজায় নামিয়ে দিলেন আর নিজের ড্রাগনদের কাছে ফিরে গেলেন, যারা, উনি বললেন, ঝড়ের পর ঘুমোতে দেরি করে। মারা কাউন্টারে ছিলেন না।

উনি নিচে ছিলেন।

আমরা তিনজন কাউন্টারের ওপর দিয়ে উঁকি দিলাম, হুলিতা, তোনিও আর আমি, সারি বেঁধে, কাঠের ওপর থুতনি রেখে, আর নিচে, ফাঁকে, মারা: গলা পর্যন্ত কম্বলে মোড়া, কানঢাকা পরা, মাথায় একটা সসপ্যান, আর সসপ্যানের ওপর টুপি, কারণ মারা এর জন্যও টুপি খোলেন না। উনি রাবারের ব্যাঙটাকে জড়িয়ে ধরে ছিলেন। আমার ব্যাঙ। যেটা কারও ছিল না। মারা ওটা কেন চেয়েছিলেন, এখন আমি জানি।

"শেষ হয়েছে?" উনি জিজ্ঞেস করলেন।

গলাটা আমি চিনতাম। বিছানার নিচ থেকে কথা বলার সময় ওটা ছিল আমার গলা।

"অনেকক্ষণ আগে," হুলিতা বলল।

মারা তবুও ওখানেই রইলেন: কম্বল, কানঢাকা আর সসপ্যান।

উনি পার্সেলটা তেইশবার পৌঁছে দিতে গিয়েছিলেন। একবারও ঝড়ে নয়।

সেদিন সকালে কাউন্টারের শেষ মাথায় উনি সবকিছু সাজিয়ে রেখেছিলেন: কম্বল, কানঢাকা, সসপ্যান। আমি দেখেছিলাম, আর পার্সেলটার দিকে তাকিয়ে ছিলাম।

"এখানে আমার কাজ।" তাই বটে। -হু.

আমি ফ্লোরার খবরটা দিলাম।

মারা জিজ্ঞেস করলেন না কোন ফ্লোরা, কোন সময়, কীসের সময়। উনি সসপ্যানটা ভুরু পর্যন্ত নামিয়ে দিলেন, সসপ্যান মাথায় থাকলে লাল হওয়ার যতটা কাছাকাছি যাওয়া যায়, আর নিচে আমার মনে হলো এমন এক হাসি দেখলাম, যেটা উনি আর ব্যবহার করেন না: কাউন্টারের পেছনে ঝুলতে থাকা দুই তরুণ জাদুকরীর পুরোনো ছবির, স্টিকার-লাগানো ছবিটার হাসি। মারা আর ফ্লোরা পরস্পরকে চেনেন, আর শুধু তেইশটা ডেলিভারির সূত্রের নয়। কীভাবে, জানি না; ওটা যাবে অন্য এক শনিবারের প্রশ্নের তালিকায়, যেটা এর মধ্যেই দ্বিতীয় পাতায়।

“আমারও মেঘের ডাকে ভয় লাগে,” আমি ওঁকে বললাম।

প্রথমবার, কেয়ারির নিচে, কথাটা বলতে আমার একটা গোটা ঝড় লেগেছিল। দ্বিতীয়বার ওটা আপনিই বেরিয়ে এল, হিকের মতো।

মারা কিছু বললেন না। কম্বলটা তুললেন।

আমি ছাঁকনিটা পরলাম, ফ্লোরার দরজা থেকে যেটা আমি ছাড়িনি। ওটা তো সেজন্যই আমাকে দেওয়া হয়েছিল। আর ওঁর সঙ্গে কাউন্টারের নিচে ঢুকে গেলাম।

আমাদের জন্য জায়গা ছিল।

মারার ছিল সসপ্যান; আমার, ছাঁকনি। উনি তখনও ব্যাঙটাকে জড়িয়ে ধরে। কাউন্টারের ওপর দিয়ে হুলিতা আর তোনিও উঁকি দিচ্ছিল। কেউ হাসছিল না।

আমরা ওভাবেই রইলাম, যতক্ষণ না মারার ভয়টা কেটে গেল, কিংবা আমার একটা পা ঘুমিয়ে পড়ল, যা একই কথা। উনি বেরিয়ে আলো জ্বাললেন, আর হুলিতা লেবেলটা কাউন্টারের ওপর রাখল, সিলমোহরের পাশে: তেইশটা ফেরত, আর তার ওপরে, পৌঁছে গেছে · ফ্লোরা। মারা ওটা না ছুঁয়ে পড়লেন, অনেকক্ষণ, যেভাবে ১ নম্বরেরটা পড়েছিলেন। তারপর কাউন্টারের শেষ মাথার দিকে তাকালেন, যেখানে আর কম্বল ছিল না, আর একটা বাক্স আনতে গেলেন।



উনি তোনিওর জন্য একটা ডেলিভারি-বাক্স উপুড় করে রাখলেন, টুলগুলোর পাশে।

"আপাতত," উনি বললেন।

"আপাতত", মারার মুখে, বেশ অনেকদিন চলতে পারে।

তোনিও বসল। বাক্সটা এত নিচু যে প্রায় হাঁটুতে থুতনি ঠেকে গেল। ও থেকে গেল।

হুলিতা ওকে সবুজ মার্কারটা এগিয়ে দিল।

ব্যাগে, "ঝড় বাদে"-র পর, তোনিও দুটো শব্দ যোগ করল:

"আর বেড়াল।"

এখন ছোট অক্ষরের লেখাটা সত্যি বলছে। -হু.

তারপর হুলিতা আমার নীল টুলে উঠল, দেয়ালের সবচেয়ে কাছেরটায়, সাইনবোর্ডের ১৯ কেটে দিল আর পাশে লিখল ১৮, বড় করে, ওটাও কেটে ফেলার ইচ্ছে নিয়ে।



বাকি ১৮



আমার প্‌ল্‌যানটা আমি ঠিক করে নিয়েছি। মেঘের ডাকের জন্য:

১. হাতি গোনা।
২. কারও সঙ্গে।
৩. হিক উঠলে কিছু যায় আসে না।

আর নিজেকে কিছুর শিকারি বোলো না। -হু.

আমরা দোকান বন্ধ করছিলাম, এমন সময় একটা ঘণ্টি বাজল।

টুং।

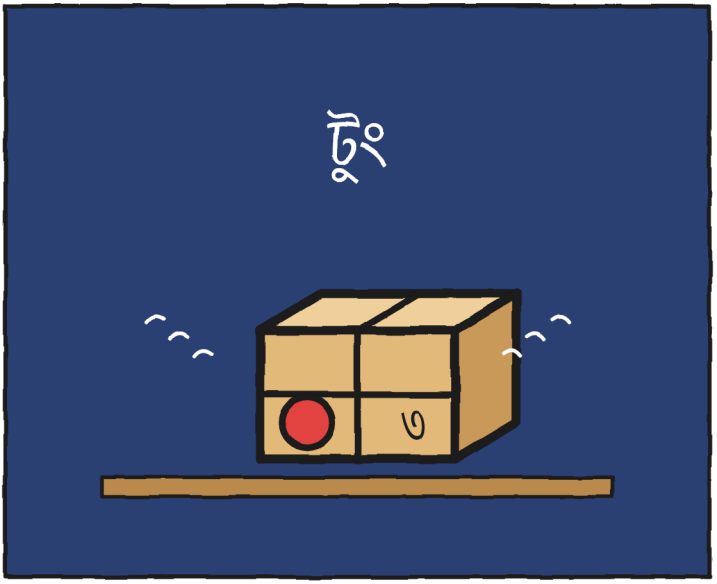
দরজা থেকে নয়। ফেরত পার্সেলের তাক থেকে: ৩ নম্বর, দুটো ফাঁকের পাশে।

আমি লেবেল পড়তে এগিয়ে গেলাম।



নং ৩ · তোনুর জন্য।

তোনিও নিজের হেলমেটের রঙের হয়ে গেল।



তোনিওকে কে পার্সেল পাঠায়? -হু.

অসম্ভব ডেলিভারি · ৩

(খুব শিগগিরই)

একটা গল্প, ছয় সাইজ

এই বইটা ছয়টা সাইজে আছে, ৩ থেকে ১৬ বছরের জন্য, আর ২০টিরও বেশি ভাষায়। XXS, XS, S, M আর L একই ছবি নিয়ে পাতায় পাতায় গল্পটা বলে, প্রতিবার আরও একটু সূক্ষ্মতা নিয়ে; XL হলো উপন্যাস: একই গল্প, যেখানে গুনি যা ভাবে অথচ বলে না, তার সবকিছুর জন্য জায়গা আছে।

CEFR অনুসারে স্তরগুলো আনুমানিক: XXS, pre-A1 · XS, A1 · S, A2 · M, B1 · L, B2 · XL, B2–C1।

যে যার সাইজে। একই ঝড়। -হু.

পরিবার ও শিক্ষকদের জন্য



linguaula.com-এ প্রতিটা অধ্যায় নিয়ে কাজ করো (L সাইজের অ্যাক্টিভিটিসহ)

⚡ সত্যিকারের ঝড়: কী করতে হবে

১. মেঘের ডাক শুনলে, দূরের হলেও, বাড়ির ভেতরে চলে এসো: বাজ ইতিমধ্যেই তোমার কাছে পৌঁছতে পারে।

২. ভেতরে, একজন বড়র সঙ্গে, জানালা, দরজা আর কাচ থেকে দূরে। গ্রিনহাউস, সেতু, গাছ আর জলের ধারেকাছেও নয়।

৩. শেষ মেঘের ডাকের পর আধঘণ্টা না কাটলে বাইরে যেয়ো না।

৪. হাতি গুনলে জানা যায় বাজ কাছে পড়েছে না দূরে, আর মনও শান্ত হয়। কখন বাইরে যেতে হবে, সেটা জানা যায় না।

তোমার ঝড় গোনো

বাড়ির ভেতর থেকে: বিদ্যুৎ-চমক আর মেঘের ডাকের মাঝে হাতি গোনো।

বিদ্যুৎ-চমক	হাতি	কিলোমিটার (প্রতি ৩-এ ১টা, মোটামুটি)	ওই বাজ কি কাছে, না দূরে?
১	১৫	৫	—
২	৯	৩	আরও কাছে

মেঘ ডাকলে তোমার হেঁচকি ওঠে? হাতি গোনো। আর কারও সঙ্গে গোনো। -হু.